আধুনিক ভারতের রূপকার

রাজা রামমোহন রায়

বিজিতকুমার দত্ত

ছবি

পার্থ সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

১

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ। পয়লা জানুয়ারি। স্থান ভাগলপুর। বেলা পড়ে এসেছে। ঘড়িতে তখন চারটে।

রাস্তাঘাট পিচঢালা নয়। ধুলো ওড়ে, জলে কাদায় কাদা। সেই ধুলোওড়া রাস্তা দিয়ে একটি পাল্কি যাচ্ছে। পাল্কিই তখন যাতায়াতের অভিজাত গাড়ি। ধুলো উড়ছে। পাল্কির দরজা বন্ধ। পাল্কি চলছে দ্রুত চালে — প্লো হি, প্লো হি। পাল্কির সঙ্গে আছে পরিচারকরা। তারাও যাচ্ছে বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে। পাল্কি ভাগলপুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। রাস্তায় লোকজন নেই। থাকবেই বা কোত্থেকে। রাস্তায় বেরোলেই তো সাদা সাহেবের হুঙ্কার। কালো আদমি ভয়েই জড়সড়। সেলাম সেলাম। তাতেও রেহাই নেই। দু'এক ঘা চাবুক যখনতখন নেমে আসতে পারে। জরুরি কাজ থাকলে রাস্তা থেকে নেমে মাঠপথ ধরো।

মোগল আমল থেকে এরকমই চলে আসছে। বাদশা হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর কর্মচারী যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন তাঁকে কুর্নিশ করতে হবে। সেই কুর্নিশ করা মানুষটির দিকে রাজকর্মচারী তাকাতেও পারেন, নাও পারেন। সেই ব্যবস্থাই চলে আসছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও।

এই আমলে অবস্থাটা যেন আরও ভয়ংকর আকার নিয়েছে। সভ্যদেশের মানুষ ইংরেজ। অসভ্য ভারতের মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করবে কেন?

কিন্তু তাদের কিছু জানার তখনও বাকি ছিল।

মোগল আমল থেকে ছাতা মাথায় অথবা ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পাল্কিতে চড়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সামনে দিয়ে যাবার উপায় ছিল

না। ছাতা বন্ধ করো — ঘোড়ার থেকে নেমে পড়ো — পাল্কি থেকে উঠে এসো — যাও এবারে।

সেই রাস্তা দিয়ে পাল্কি যখন চলছে তখন সেখানকার কালেকটার সার ফ্রেডরিক হ্যামিলটন একটা ইঁটের পাঁজার উপর দাঁড়িয়ে। তার সামনে দিয়ে চাপরাশি বরকন্দাজ নিয়ে একজন চলে যাবে? কী দুঃসাহস! কী আস্পর্ধা! হ্যামিলটনের মর্যাদায় ঘা লাগল। পাল্কির আরোহী তো নামলেন না। রেগে আগুন তখন হ্যামিলটন। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে পাল্কিকে আটকালেন।

ভেতরের আরোহী নেমে এলেন। ভদ্রভাবে নমস্কার জানিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। সাহেবের রাগ দেখে আরোহী যত বোঝাবার চেষ্টা করেন হ্যামিলটন তত রেগে ওঠেন। তিনি বললেন তাঁর পরিচারকরা সাহেবকে দেখতে পায়নি। দেখলে তাঁকে সম্ভ্রম জানানো হত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কী করেন আরোহী মানুষটি। তাঁরও তো মর্যাদা আছে। রায়রায়ান বংশের ব্রাহ্মণ তিনি। তাঁর মেলামেশা দেশী-বিদেশী অভিজাতদের সঙ্গে। কথা না বাড়িয়ে সাহেবকে উপেক্ষা করে আবার পাল্কিতে উঠলেন। চলে এলেন ভাগলপুরে। কিন্তু ঘটনাটাকে হালকা ভাবে নিলেন না মানুষটি। এর প্রতিবাদ করতে হবে। নইলে এঁদের দাপট বেড়েই যাবে। সূর্যের চেয়ে বালির তাত বেশি এই যারা ভাবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

কিছুদিন পর তিনি লর্ড মিন্টোর কাছে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে এর প্রতিকারের জন্য আবেদন করলেন। মোগল আমলের ছেঁড়া তমশুককে বাতিল করতে বললেন। মিন্টো এর পরই আদেশ দেন হ্যামিলটন যেন ভবিষ্যতে এরকম অসদ্ব্যবহার না করেন।

যে আইন মানুষের পক্ষে অবমাননাকর তাকে বাতিল করার প্রতিজ্ঞা সেদিন এই মানুষটি নিয়েছিলেন। পেরেওছিলেন আইনের সংশোধন করতে, নূতন আইন তৈরি করার পরামর্শ দিতে। এ মানুষটিই রাজা রামমোহন রায়।

২

নবাব আমল।

হুগলি জেলার রাধানগর গ্রাম। এই গ্রামের নামডাক খুব। এখানে বাস করেন 'রায়রায়ান' বংশের মানুষেরা। নবাবের কাছে এঁদের খাতির ছিল। নবাবের কর্মচারী হিসাবে ছোটখাট জমিদার এঁরা। প্রচুর জমির মালিক রায়রায়ান বংশের প্রচুর বিত্ত।

রামমোহন এই বংশেরই ছেলে। জন্ম ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। পিতা রামকান্ত

রায়ের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। মাতা তারিণী দেবী। রামকান্ত রায়ও নবাবের কর্মচারী ছিলেন। অর্থে, প্রতিপত্তিতে তিনি তখন কীর্তিমান পুরুষ। রামকান্ত রায়ের তিন স্ত্রী-র মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। এই মহিলা তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠাবতী ছিলেন। রামমোহনের জীবনে মায়ের প্রভাব পড়েছিল।

রামমোহনের শিক্ষার আরম্ভ রাধানগর গ্রামেই হয়েছিল। নবাব-দরবারে চাকরি করতে গেলে আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রয়োজন। রামমোহনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাটনায়। আরবি-ফারসিতে রামমোহন কেবল বিদ্যাচর্চাই নয়, একেবারে মজে গেলেন। এই দুই ভাষাকে এমন আয়ত্ত করলেন যে এ ভাষায় কথা বলতে, আলোচনা করতে, চিন্তাভাবনা করতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হত না। এমনকী কঠিন জিনিসকে পর্যন্ত তিনি সহজ করে বলতে লিখতে পারতেন আরবি-ফারসিতে। পাটনায় তিনি কতদিন ছিলেন আমরা জানি না। রামমোহনকে তারপর সংস্কৃতশিক্ষার জন্য কাশীতে চলে যেতে হয়। এখানেও তিনি কতদিন ছিলেন ঠিক জানা নেই। অ্যাডাম (রামমোহনের বন্ধু) সাহেব বলেছেন কাশীতে রামমোহন দশ বছর ছিলেন। কাশী সংস্কৃতচর্চার বিখ্যাত জায়গা। বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের বাস এখানে। ওই দশ বছরে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার লুঠ করে নিলেন রামমোহন। বেদবেদান্ত, মীমাংসা, স্মৃতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র তখন তাঁর নখদর্পণে। এই দুই ভাষায় বিদ্বান রামমোহন যে সমাজে ও রাজদরবারে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই পড়াশোনার সময়েই ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের জিজ্ঞাসা জাগে। আর এতকাল ধর্ম বলে হিন্দু-মুসলমান যা মেনে এসেছে তার সম্পর্কে রামমোহনের সন্দেহ জাগে। ষোল বছর বয়সে নাকি তিনি একটি ছোটো প্রবন্ধও লিখে ফেলেছিলেন। আর একেশ্বরবাদের দৃষ্টি নিয়ে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন 'তুহ্ফাৎ উল মুয়াহ্হিদিন' নামে চাঞ্চল্যকর একটি বই।

রামমোহন প্রথম জীবনে চোদ্দ বছর বাড়িতে ছিলেন। এই সময়ে তিনি পেয়ে গেলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারকে। নন্দকুমার ছিলেন

সংস্কৃতের অধ্যাপক, পরে তন্ত্রসাধক। তখন তাঁর নাম হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত। রামমোহন তো বসে থাকবার লোক নন। তিনি নন্দকুমারের কাছে সংস্কৃত বিদ্যার পাঠ নিলেন। আর নন্দকুমারের ঝোঁক ছিল তন্ত্রসাধনার দিকে, ফলে রামমোহনও তন্ত্রবিদ্যায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তন্ত্রের হাড়হদ্দ জেনে নিলেন তিনি।

এরপর গেলেন তিব্বতে। সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পথের কষ্ট সহ্য হয়েছিল। কিন্তু যেই দেখলেন তিব্বতে লামাদের ঈশ্বর বলে পুজো করা হচ্ছে, তাঁর মন বিদ্রোহ করে উঠল। এ কেমন কথা? ঈশ্বর তো এক। এখানে লামারা সকলেই ঈশ্বরের জায়গা নিয়েছেন। রামমোহন প্রতিবাদ করলেন।

মৌচাকে ঢিল পড়ল। রামমোহনকে চারদিক থেকে আক্রমণ। পালিয়ে আসার পথ পান না। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিব্বতের মেয়েদের দয়ায়। তাঁরাই রামমোহনকে ভারতে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন। রামমোহন জীবনে ভুলতে পারেননি এই তিব্বতি মায়েদের কথা। রামমোহন যে পরে নারীর জন্য এত ভেবেছিলেন সে তো তিব্বতের মেয়েদের কাছ থেকেই তাঁর শেখা।

রামমোহন রাধানগরের বাড়ি ছেড়ে বাবার সঙ্গে লাঙুলপাড়ায় চলে এলেন। এখানে বাবা রামকান্ত রায় নূতন করে ভিটে তৈরি করলেন। সে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের কথা। সকলের সঙ্গে রামমোহনও বাবার বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন ওই সময়ে। হঠাৎ কী হল জানা যায় না — রামকান্ত রায় একটি উইল করে তাঁর বিষয়সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেন। রামমোহনের ভাগে বাড়ির কিছু অংশ, আশি বিঘের মতো জমি। রামমোহনের ভাগে রামকান্ত রায়ের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িটিও পড়ল।

রামকান্ত এরপর বর্ধমানরাজের চাকরি নিয়ে বর্ধমানে চলে গেলেন। রামমোহন মা-কে নিয়ে লাঙুলপাড়াতেই থেকে গেলেন। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে দেখা করতে বর্ধমানে যেতেন। বিষয়কর্মের জন্য কলকাতায়ও গিয়েছেন কয়েকবার। ভুরশুটেও জমিদারি ছিল। সেখানেও যেতে হত রামমোহনকে। রামমোহন তাঁর জমিদারির এলাকা বাড়িয়েই

যেতে লাগলেন। কিনে নিলেন গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরের দুটি তালুক। এ তালুক দুটির আয় ছিল বছরে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা।

এরপর রায়পরিবারে নেমে এল দারুণ দুর্যোগ। রামকান্ত দেনার দায়ে পড়লেন। তাঁকে জেলে পাঠানো হল। দাদা জগমোহনও দেনার দায়ে জেলে গেলেন। রামমোহনের বিচক্ষণতা এসব বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করল। তিনি কিছুকালের মধ্যেই কলকাতা ঘুরে এলেন এবং রংপুরে দেওয়ানি পাবার জন্য দরখাস্ত করলেন। এই উপলক্ষে রামমোহনকে সেকালের সাহেবসুবোরা ভালো সুপারিশপত্র দেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দেই রামমোহন কলকাতায় জন ডিগবির সঙ্গে পরিচিত হন। জন ডিগবি ছিলেন উঁচু পদের ইংরেজ সিভিলিয়ান। রামমোহনের শিক্ষাদীক্ষা এবং আধুনিক চিন্তা গঠনে গুরুতর ছিল এঁর প্রভাব।

কলকাতায় এসে রামমোহন রোজগারে মন দিলেন। উডফোর্ড সাহেবের দেওয়ান হলেন কিছুদিন।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। রামকান্তের শ্রাদ্ধ কে করবে এ নিয়ে গোলমাল দেখা দিল। ঘোঁট পাকানো হল। রামমোহন কলকাতায় শ্রাদ্ধ করলেন, তাঁর মা তারিণী দেবী লাঙুলপাড়ায় শ্রাদ্ধ করলেন আর জগমোহন মেদিনীপুর জেলে। আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার কী বিচিত্র গতি! রামমোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি। এ তো সহজেই বোঝা যায়। পৈতৃক সম্পত্তি, নিজের কেনা জমির আয়, দেওয়ানি করার সূত্রে অর্থলাভ, কোম্পানির কাগজপত্র কেনাবেচা করে আয়। কম কী!

১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রামমোহন ডিগবির কাছাকাছি ছিলেন। তিনি জন ডিগবির সেরেস্তাদার এবং দেওয়ান ছিলেন। রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর, রংপুর এই সব জায়গায় তিনি ডিগবির সঙ্গে ছিলেন। আসলে ডিগবির অধীনে রামমোহন যে চাকরিই করেছেন এমন নয়, চাকরি চলে গেলেও ডিগবি তাঁকে ছাড়েননি। ডিগবির মুন্‌শি হয়ে ছিলেন রামমোহন বেশির ভাগ সময়। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র ছিল দৃঢ়। লোকে রামমোহনকে বলত 'ডিগবির দেওয়ান'।

এখানে রামমোহনের ভুটানযাত্রার কথা বলা যাক। জলপাইগুড়ির

কাছে ভুটানের সীমান্ত মরাঘাটের সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। রামমোহন ডিগবির সঙ্গে এই সীমানা বিরোধের সমাধানের জন্য কুচবিহার গিয়েছিলেন। কিন্তু ডিগবি শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ভুটানের রাজা বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে চাইলেন। এবারে সেরেস্তার কর্মচারী কৃষ্ণকান্ত বসুর সঙ্গে রামমোহন দূত হয়ে ভুটানে গেলেন। ভুটানের পথও দুর্গম। আর দুর্গম পথে যাবার আগ্রহ তো রামমোহনের থাকবেই। ভ্রমণ আর ভ্রমণ — এই নেশাই তাঁকে বিশ্বপথিক করে তুলেছিল। গোয়ালপাড়া থেকে বিজনি, বিজনি থেকে সিডলি আর চেরঙ্গ — সেই পথে পাচু মাচু উপত্যকা পেরিয়ে ভুটানের রাজধানী পুনাখ। কিন্তু দু'মাস রামমোহন সেখানে বসে রইলেন। রাজার সঙ্গে দেখা হয় না। পরে রাজার দেখা পেলেন এবং দূত হিসেবে সফলও হলেন। যে দু'মাস বসেছিলেন, সে কদিন নিশ্চয়ই রামমোহন ভুটানের সাধারণ মানুষজনের সংস্কৃতির খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

রামমোহনের বিষয়সম্পত্তি চাকরিবাকরির কথা একটু বেশি বলা হল এটা বোঝাবার জন্যে যে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বাস করার জন্য টাকার জোগাড় না করে মনস্থির করতে রামমোহনের সময় লেগেছিল বেশ কিছুকাল। দ্বিতীয়ত আমরা দেখছি চাকরিবাকরির সূত্রে ইংরেজ সিভিলিয়ান এবং কর্মচারীর সংস্পর্শে এসে ইংরেজি আদবকায়দা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্ব -রাজনীতি এবং -চিন্তাধারার সঙ্গে রামমোহন পরিচিত হতে পেরেছিলেন। দেশের আইনকানুন সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান হয়েছিল ভালোরকমের। ইংরেজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাঁর বন্ধুমহলের চৌহদ্দিও বেড়ে গিয়েছিল। কলকাতার গণ্যমান্য বিদেশীরা এলে রামমোহনের সঙ্গে দেখা না করে যেতেন না। কোনো কোনো বিদেশীর মনেও হয়েছে যে রামমোহনই যথার্থ ভারত-আবিষ্কারক।

রামমোহনের স্বাস্থ্য ছিল খুব মজবুত। দিনে আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারতেন। খাওয়ার বিলাসিতা ছিল। বারো সের দুধ আর চার সের মাংস একবারেই খেতে পারতেন। পঞ্চাশটা ডাবের জলে তেষ্টা মেটাতেন। চল্লিশটা আম দিয়ে জলযোগ। নাচ-গান-পার্টি

ভালোবাসতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেছেন অনেকে। ফিটসক্লারেন্স (আর্ল অব মানচেস্টার), ফরাসি বৈজ্ঞানিক ভিক্টর জাকমঁ ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানি পার্কার এসেছেন রামমোহনের কাছে। ফ্যানি পার্কার রামমোহনের বাড়িতে একটি উৎসবে হাজির ছিলেন।

সন্ধেবেলার পার্টি। ধনী বাঙালিদের সমাবেশ। বাড়ির সামনের অংশ আলো দিয়ে সাজানো আর চমৎকার বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। ঘরে ঘরে নাচওয়ালী নাচ-গান করছে। গান যে পার্কারের খুব ভালো লেগেছিল এমন নয়। এই নাচওয়ালীদের মধ্যে সেকালের নিকী বাঈজীও ছিলেন।

রামমোহন মুসলমানি আদবকায়দা কিছু কিছু পছন্দ করতেন। জোব্বা চাপকান পরতেন। এই পোষাকেই তাঁকে মানাত। কেউ কেউ মনে করতেন রামমোহন মুসলমানদের সঙ্গে পানভোজন করতেন। সেটা অবশ্য ঠিক নয়। রামমোহন এই কথাটাকে গ্রাহ্যই করতেন না। তিনি মুসলমান বন্ধুদের সাদরে গ্রহণ করেছেন। বারবার বলেছেন হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং দেশপ্রেম সমান।

রামমোহনের পৈতৃক বাড়িতে ছিল বৈষ্ণব বিগ্রহের অধিষ্ঠান। পরম বৈষ্ণব ছিলেন এই বংশের মানুষেরা। মাতা তারিণী দেবী একাকিনী শ্রীক্ষেত্র চলে যান। ১৮২২ সালে বৈষ্ণবের তীর্থস্থানেই তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়। রামমোহন অবশ্য বৈষ্ণবতায় আর বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মন্ত্র ছিল — ওঁ তৎসৎ। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও তাঁর শেষ কথা ছিল — ওঁ তৎসৎ।

৩

রামমোহনের লেখাপড়ার ব্যাপারটা বলা যাক। তার আগে সেকালে দেশগাঁয়ে লেখাপড়া চলত কীভাবে সেটা একটু জেনে নিই। টোল-চতুষ্পাঠী আর মক্তব মাদ্রাসাতে ছেলেরা পড়াশোনা করত। সে শিক্ষা ছিল খানিকটা একঘেয়ে। অ আ ক খ, কিছুটা নামতা, কিছু হিসেবনিকেশের নবিশি। ব্যস, তারপর সারাজীবন অপরের কথামতো অথবা সমাজের নির্দেশ মেনে চলা। কাজীর বিচার আর ব্রাহ্মণের

বিচারকে ভগবানের নিয়ম বলে ধরে নেওয়া। আরও বেশি এগোতেন যাঁরা, তাঁরা পড়তেন কলাপ ব্যাকরণ, ন্যায়স্মৃতিশাস্ত্র। অন্যদিকে মৌলভিরা যা পড়াতেন সেখানেও ছিল লেখাপড়ার ঐরকম পাঠ। মৌলভি আর পুরোহিত-ই ছিলেন সবকিছুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

রামমোহনের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল টোলচতুষ্পাঠীতেই। কিন্তু তিনি মনোযোগী ছাত্র। আর সবকিছুকে খুঁটিয়ে, তন্নতন্ন করে জানবার ইচ্ছা। মনে সন্দেহ ঢুকলেই তা দূর করতেন আরও পড়ে, আরও জেনে। খুব সামান্য কাজ-চালানো গোছের ইংরেজি তখন কেউ কেউ পড়ত অবশ্য। রামমোহন সে পথে তখন পর্যন্ত যাননি। আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে ইংরেজি শেখার যে নমুনা পাই তা দেখে এবং শুনে হাসি পাওয়ার কথা।

রামমোহন এর পরে চলে গেলেন পাটনা। পাটনা ছিল সে সময়ে আরবি-ফারসি শেখার রাজধানী। রামমোহন আরবি-ফারসি ভাষায় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। আর সেই সূত্রে ইসলাম ধর্মের সব কিছু রামমোহন জেনে নিলেন। কোরান শরীফ পড়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি প্রতিমাপূজায় আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। একেশ্বরবাদী হয়ে উঠলেন রামমোহন। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। ইসলাম ধর্মের উপাসকদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায় নামে একটা গোষ্ঠী ছিল। তাঁরা তর্কবিতর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। বিচার করতেন। বড়ো কথা হল তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ মানতেন না। রামমোহন এঁদের কাছে পেলেন এক উদার ধর্মের রূপ। সে ধর্মে সকলের মিলেমিশে থাকার কথা। কিছুকাল পরে তিনি সূফী মরমিয়াদের ধর্মকে জেনে আরও খুশি হয়েছিলেন। হাফিজ, রুমি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। আরবি-ফারসিতে কথা বলতে তাঁর বিন্দুমাত্র আটকাত না। রামমোহনকে মৌলভি বলতে পারি আমরা? আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই মরমিয়া কবি ধর্ম-প্রচারকের গান এবং লেখা পড়ে নিজের ধর্মমত গঠনে বেশ উৎসাহিত হয়েছিলেন। আর সূফী সাধকদেরই একটা সম্প্রদায় আমাদের বাউল সাধকরা। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে মানুষের ধর্মবোধের বিকাশে এই বাউলদের

কথা টেনে এনেছেন। তাঁর ভাবনাচিন্তায় উঠে এসেছিল মানুষের ধর্মের এক উদার মন্ত্র। বাউল বলেছিলেন, হে সাঁই, তোমার পথ ঢেকে দিয়েছে মন্দির আর মসজিদে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই ঢাকা পথকে আলোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রামমোহন চলে গেলেন কাশীতে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ চর্চার কেন্দ্র এই কাশী। মধ্যযুগে চৈতন্যও কাশীতে এসেছিলেন। কাশীতে

প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিচার করে রামমোহন বুঝিয়ে দিলেন মানুষকে মানতে হবে। মানুষকে ছাড়া ঈশ্বরের চলে না। রামমোহনের তখন মন তৈরি হচ্ছে একেশ্বরবাদের দিকে — একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদের পাঠ নিলেন। ব্রহ্মসূত্র পড়লেন। গীতাকে বুঝে নিতে চাইলেন। উপনিষদ পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন প্রতিমাপূজার কোনো মানে হয় না। প্রতিমাপূজা সম্পর্কে যেটুকুও বিশ্বাস ছিল একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল উপনিষদের জ্ঞান লাভ করে। কেবল কি তাই? হিন্দুধর্মের ধর্মশাস্ত্র সবই পড়লেন। পড়লেন ষড়্দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিনিবন্ধ। অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্রকে অধিগত করলেন প্রচণ্ড পরিশ্রম নিয়ে। পড়ার জন্যেই পড়া নয়, পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি বুদ্ধি আর অনুভব দিয়ে জানতেও চাইলেন, মানুষের জীবনে অধ্যাত্মভাবনার স্থান কোথায়। বিভেদবুদ্ধির কারণ কী। অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনার মোহ কেন এল। জ্ঞান আর জ্ঞানের প্রসার চাই। তাহলেই ঝাপসা ভাবটা কেটে যাবে, অন্ধকার চলে যাবে, ফুটে উঠবে আলো।

রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে একবার এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসেছিলেন। সেখানে আর্নট সাহেবও ছিলেন। রামমোহন তাঁর সঙ্গে সারা দিন বিচার-বিতর্ক করেছেন। আগের দিনে শাস্ত্রবিদ্‌রা বেরিয়ে পড়তেন দিগ্বিজয়ে। বড় বড় পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করে তাঁরা দিগ্বিজয়ী বনে যেতেন। রামমোহন ঘরেবাইরে এই দিগ্বিজয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ 'বজ্রসূচী' বইটি বাংলা অনুবাদ করে রামমোহন প্রকাশ করেছিলেন। জৈনদের 'কল্পসূত্র' বইটিও তিনি পড়েছিলেন।

রামমোহনের জ্ঞানার্জনের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ভ্রমণসূত্রে উত্তরভারতের সঙ্গে রামমোহনের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাই ১৮২৩ সালে তাঁর লেখা 'প্রার্থনাপত্রে'। তিনি বলেন হিন্দুদের দশনামা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, গুরু নানকের সম্প্রদায় আর দাদূ ও কবীর-পন্থী এবং সন্তমতের সাধকরা একেশ্বরবাদ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের বাদ দিলে ধর্ম মিথ্যা হবে।

৪

তখন মাত্র ষোল বছর বয়স রামমোহনের। ঐ বয়সেই তাঁর মনে হয়েছিল অনেক দেবতা নেই। আছেন এক দেবতা। তিনি ব্রহ্ম।

বুঝতে অসুবিধে হয় না রামমোহনের এই ভাবনার সঙ্গে সে সময়ের মানুষের ভাবনার মিল হচ্ছিল না। হিন্দুধর্মে কত দেবতা! তাঁরা সব বাদ যাবেন আর থাকবেন ব্রহ্ম, একা? মানতে পারলেন না তাঁর দেশের মানুষ আর আত্মীয়স্বজন। এমনকী রামমোহনের বাবাও ছেলের উপর চটে গেলেন। রামমোহন আর কী করেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঐ বয়সেই রামমোহনের ছিল নিজের ভাবনার উপর প্রবল বিশ্বাস। তিনি তো অনেক বিচার করে এই কথা বলেছেন। তাঁর ভুল যদি কেউ দেখিয়ে দেন তবে তিনি খুশি হবেন, নচেৎ নিজের বিশ্বাসকেই মেনে চলবেন।

ষোল বছরের লেখাটা তিনি ছাপতে পারেননি। কী করেই বা পারবেন? তখন বাংলা ছাপাখানা তো খুব বেশি ছিল না। কিন্তু আরও পড়ে আরও বিচার করে তিনি তিরিশ বছর বয়সে একখানা ফারসি বই লিখলেন এবং তা প্রকাশও করলেন। বাংলায় না লিখে ফারসি ভাষায় লিখলেন কেন? যাঁরা আরবি ভাষা জানেন না তাদের কাছে তিনি পৌঁছে যেতে পারবেন ফারসি ভাষার সাহায্যে। আগে আরবি ভাষায় এইরকম একটি বই লিখেছিলেন। সেটা বোধহয় সকলের কাছে পৌঁছয় নি। এখন যেমন ইংরেজি ভাষা, সে-আমলে তেমনি ছিল ফারসি ভাষার কদর। রামমোহন লিখলেন 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন' গ্রন্থ।

এই বইতে রামমোহন দেখালেন, কিছু মানুষ ধর্মগুরু সেজে বসেন। তাঁদের চেলাচামুণ্ডাও জুটে যায়। আর ধর্মকে এমনভাবে মানুষের

সামনে তুলে ধরেন যাতে তাঁদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার সুবিধে হয়। সত্যকে গোপন করে মিথ্যার জাল দিয়ে মানুষকে তাঁরা বোকা বানান। আর সাধারণ মানুষও মনে করে পাথরই বুঝি দেবতা, গাছই বুঝি ঈশ্বর। এমনই তাঁদের ক্ষমতা যে কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বললে তারা নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করেন। রামমোহন এও দেখেছেন ভারতে এখন ধর্মের এমনই অবস্থা। কিছু ব্রাহ্মণ ধর্মের নামে ভুলভাল বোঝাচ্ছেন, শাস্ত্রকে তাঁদের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। খ্রিস্টান পাদ্রিরাও ভুল বোঝান মানুষকে। ইসলামের ধর্মগুরুদের মধ্যেও এই রকম ভণ্ডদের দেখা পাওয়া যায়।

রামমোহন খুব জোর দিয়েই বলেছেন, ঈশ্বর কোনো দূত বা অবতার পাঠাননি পৃথিবীতে। আমরা নিজেরাই বিচার করে সত্যকে খুঁজে বার করব। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিনই তিনি খুঁজেছেন সত্যকে। কষ্ট পেয়েছেন, ধৈর্য হারাননি, গালমন্দ দিয়েছে তাঁর শত্রুরা — তিনি ভদ্র থেকেছেন আর হাফিজের কথা মনে রেখে বলেছেন, কারও অনিষ্ট কোরো না, তুমি নিজে যা ভাল মনে কোরো তাই করে যাও, কারণ অন্যের অনিষ্ট করার মতো পাপ আর কিছু নেই। এইরকম কথাই বলতেন রামমোহন সব সময়।

এই বইটির সম্বন্ধে পরে তিনি বলেছিলেন, যদিও তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন তবু প্রতিমাপূজা মূর্তিপূজা মানতে পারেননি। এ সব কথা বলার জন্য তিনি বিপদেও পড়েছিলেন। বাপ-মা-র কাছ থেকে তিরস্কারও পেয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ঘৃণা করেছেন, দেশের মানুষও তাঁকে সহ্য করতে পারেনি।

৫

রামমোহনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে, ১৭৭৪ সালে। সে সময়ে ইংরেজ ধীরে ধীরে ভারতে তাদের শাসন শুরু করেছে। গোটা ভারতকেই জয় করবার স্বপ্ন দেখছে ইংরেজ।

ইংরেজদের কাছাকাছি এসে ভারতবাসীর চোখ খুলতে শুরু করল।

ভারতবর্ষে বাস করছে নানা জাতি। নানা ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। ভেদ-বিভেদের শেষ নেই। কিন্তু রামমোহনের জন্মের বহুকাল আগে থেকেই এই ভেদ-বিভেদকে মানেননি একদল মানুষ। তাঁরা তীর্থভ্রমণে বের হতেন। মানুষের সঙ্গে মিশতেন খোলামেলাভাবে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তফাৎ মানতেন না তাঁরা। হিন্দু ধর্মের নাম করে ছত্রিশ বর্ণের যে মিথ্যা ভাগ করা হয়েছে তার ভণ্ডামিকেও তাঁরা বরদাস্ত কবতেন না। কবীর, দাদূ, রজ্জব, নানক, চৈতন্য বারবারই বলেছেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ-বিভেদ নেই। আসলে তাঁরাও যে নূতন কথা বলেছেন এমন নয়। ভারতের মন্ত্রই তো ছিল এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। দাদূও বললেন সেই কথা : আমি জানি দুই নেই, আমার পথ এক। কবীর তো বলতেন : আমি ভারতপথিক। অর্থাৎ ভারত একটি পথই জানে সে পথে সকলের সঙ্গে আমরা এক। রজ্জব বলেন, গুরুর কাছে বলেছি হিন্দু-মুসলমান যেন মিলে যায়। ভেদ-বিভেদের কথা ভুলে গিয়ে মিলনের কথাই বলেছেন ঐ পথিকেরা। রামমোহন একালে সেই পথের পথিক। একেই আমরা বলি আধুনিক কাল।

এও আমরা দেখতে পাই, একালের ধর্ম নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের নানা জায়গায় — এমন-কী ভারতের বাইরেও গেছেন এই পথকে জানবার জন্যে। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী — কত নাম করব!

রামমোহনের ভ্রমণের নেশা ছিল। বিদ্যালাভের জন্য, ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যে, চাকরি, ব্যাবসা প্রভৃতির জন্যে রামমোহন অল্প বয়স থেকেই ভারতের নানা জায়গায় গিয়েছেন। তাঁর 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদিন' বইতে বলেছেন তিনি ভারতের দূর-দূরান্তে গিয়েছেন। এমনকী পাহাড়-পর্বতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। পাটনা, কাশী আর উত্তর ভারতের নানা জায়গায় তিনি ছিলেন। তিব্বতে গিয়েছেন। ভুটানেও তিনি কষ্ট করে গিয়েছেন। রংপুরে ছিলেন কিছুকাল। কলকাতায় তো তিনি তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। অবাক লাগে

লাঙুলপাড়া-রাধানগরের গ্রামের ছেলে কেবল মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য ভারতের সব জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন।

তারপর তাঁর মনে জাগল ইউরোপ-ভ্রমণের কথা। সেখানেও তিনি যেতে চাইছিলেন ইউরোপবাসীর আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, ধর্মপ্রাণতা আর রাজনীতিকে বোঝবার জন্যে। রামমোহনের সময়ে কালাপানি পেরিয়ে ইউরোপ যাওয়া সহজ ছিল না। কেননা দেশের মানুষ তাহলে রামমোহনকে একঘরে করে দেবে। রামমোহন ভ্রূক্ষেপ করলেন না কোনো কিছুকেই। ইউরোপভ্রমণে তাঁর সঙ্গে ছিল মুসলমান বাবুর্চি। বিদ্যাসাগরও লণ্ডন যাবার কথা ভেবেছিলেন। তবে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়াকে জিজ্ঞাসা করা, কেমন করে মেয়ে হয়েও ভারতবর্ষে বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করছেন। রামমোহনও তো সতীদাহে নারীহত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন ইউরোপে আর দেশবিদেশে ঘুরে তিনি এই একটা কথাই তো বলতে চেয়েছিলেন : মানুষে মানুষে কোনো ভেদ-বিভেদ নেই। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মিলনের মন্ত্রই প্রচার করেছিলেন তিনি।

৬

রংপুরে থাকতেই ডিগবির দেওয়ান রামমোহন কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্বদেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। স্বদেশের ডাক যেন তিনি শুনতে পেলেন। আর তিনি চাকরি নিলেন না। কলকাতায় চলে এলেন ১৮১৪ সালে। আগেই কেনা ছিল বড়ো বড়ো বাড়ি। মানিকতলার বাড়িতে তিনি এসে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বদেশব্রতে আরও কিছু মানুষ চাই। মিশনারিরা মিলেমিশে কাজ করেন, দেখেছেন। তাঁরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন 'আত্মীয়সভা', ১৮১৫ সালে। এখানে আসতেন গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুনশি, নন্দকিশোর বসু, বৃন্দাবন মিশ্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদারের মতো সেকালের আধুনিক চিন্তাভাবনায় উৎসাহী মানুষরা।

'আত্মীয়সভা'? হ্যাঁ রামমোহন বন্ধুদের আত্মীয় বলেই মানতেন। এই সভায় সকলের ছিল অবারিত দ্বার। সভায় ধর্ম, শিক্ষা, সমাজসমস্যা নিয়ে তর্কাতর্কি হত। কেউ কোনো প্রশ্ন পাঠালে তার উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই 'আত্মীয়সভা' কলকাতায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। এঁরা নূতন, এঁরা চঞ্চল, এঁরা প্রাণের বেগে চলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ এতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতকাল বেশ নিশ্চিন্তে ছিলেন এঁরা। দোল, দুর্গোৎসব, নন্দোৎসব, কীর্তন, রথযাত্রা। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থে ভ্রমণ, উপোস করে থাকা, এই ছিল ধর্মের বিধান — আমাদের সকল পাপ থেকে পরিত্রাণ। চড়কের বাণফোড়া, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন — এও পাপ থেকে মুক্তি এনে দেয় নাকি। আর নূতন নূতন জমিদাররা তাদের ছেলেদের পাঠাতেন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কিছু সাহেবের স্কুলে। ছেলেরা সেখানে পড়ত কিনা জানি না, অঢেল টাকাপয়সা পেয়ে যত রকমের বেলেল্লাপনায় তারা দক্ষ হয়ে উঠত। এইসব ছেলেরা ছিল সেকালের বাবু।

আত্মীয়সভা এর প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল।

আগে রামমোহন আরবিতে-ফারসিতে লিখেছিলেন, এবারে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলেন বেদান্ত গ্রন্থ। এই বইটির নামপত্রে রামমোহন বেদান্তকে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করলেন। এও লিখলেন একমাত্র তিনিই (ব্রহ্ম) আমাদের পূজ্য। ১৮১৫ সালে ওই বই বেরোবার পরই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ঘুম ভাঙল। রামমোহনের লেখার জবাব তাঁরা দিলেন। রামমোহনও থেমে থাকেননি। বেদান্তের সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিলেন। আর এ কাজে তাঁর মতো দক্ষ সেকালে আর কেউ ছিল না। রামমোহনের বেদান্তের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রতিবাদীপক্ষ বই লিখলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ বড়ো বড়ো সংস্কৃতজানা পণ্ডিত রামমোহনকে প্রতিবাদ করলেন জোরালো ভাষায়। আর রামমোহন তার জবাব দিতে লাগলেন। এইরকম শাস্ত্রবিচার উনিশ শতকে খুব বেশি দেখা যায়নি।

রামমোহনের বিরোধীরা প্রতিবাদের সময় কখনও কখনও ভদ্রতার

সীমা লঙ্ঘন করেছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেননি। ঠাট্টাবিদ্রূপ তো করেইছেন। গালিগালাজ করেছেন এমন ভাষায় যে রামমোহন প্রতিবাদের সময়ে বলেছেন, সে ভাষা লেখা যায় না। রামমোহনের ভাষা একটু শোনা যাক। মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে২ অশ্বচিকিৎসা ও গোপের শ্বশুরালয় গমন ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইহাতে ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ চালে ফলতি কুষ্মান্ডং।' হাটারি বাজারি কথা নয়। এই প্রতিবাদের ভাষা জোরালো এবং মর্মভেদী। রামমোহন জোর দিয়ে বলেছেন 'বিবেচনা করিবেন যে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধরূপে শুনা যায় যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না এবং ব্রহ্ম একমাত্র আর যাবৎ নামরূপ সকল প্রপঞ্চ'। এই হচ্ছেন রামমোহন। কেবল মানুষ নয়, সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা বেদান্তের নির্দেশ। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

রামমোহনকে মৃত্যুঞ্জয় বলেছিলেন, ন্যাবার চিকিৎসায় তিনি ঘোড়ারোগের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনকে পাষণ্ড বলেছেন। রামমোহন কাশীনাথকে উত্তর দিলেন 'পথ্যপ্রদান' বই লিখে। রক্ষণশীল পণ্ডিতরা শাস্ত্রের বিচার না করে শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তারই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মনে কোনো জিজ্ঞাসা জাগেনি। কিংবা শাস্ত্র লিখেছেন যাঁরা, তাঁদের বিভিন্ন শাস্ত্রকারের মধ্যে যে মতভেদ আছে এবং একজনের সঙ্গে আর এক জনের বিস্তর পার্থক্য আছে, সেটাও বিরোধীরা দেখিয়ে দিচ্ছেন না। রামমোহন কিন্তু পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মতামত যাচাই করেছেন, পণ্ডিতদের নিজেদেরই যে একে অপরের সঙ্গে মতামতের গরমিল রামমোহন সেগুলি পরীক্ষা করেছেন। রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা সেই পুরোনো যুক্তি বা বিশ্বাস প্রচার করতে লাগলেন। রামমোহন বাংলা ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। এ অতি অন্যায় কাজ। রামমোহন অধার্মিক, পাপী। কারণ, তিনি ম্লেচ্ছ, অস্থানে তাঁর যাতায়াত আছে। রামমোহন ধর্মসংহারক। রক্ষণশীল সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সব গেল। দেবতার মূর্তিপূজা বন্ধ করতে

চাইছেন রামমোহন। আর বহুদেবতার অস্তিত্বকে মানছেনই না। তাঁরা এও লক্ষ করছিলেন যে ধর্মকে আশ্রয় করে এতদিন মানুষ নিশ্চিন্ত ছিল, তার বিরুদ্ধে রামমোহন জেহাদ ঘোষণা করছেন। সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এতদিন যে শান্তি ছিল, তা ভেসে যাচ্ছে। সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের আধুনিক চিন্তার পরিচয় পেয়ে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সুতরাং আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতি-আঘাত হানতে হবে।

সাধারণ মানুষ এত শত চিন্তা করে না। তারা প্রাচীন শাস্ত্রকে মেনে চারিদিকে প্রাচীর তুলে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকেন। রামমোহনের লেখায় ঘুমভাঙানিয়ার ডাক। সকলকে তিনি বলছেন, ঝগড়ার বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে লাভ নেই। বিচার তর্ক আর জ্ঞান দিয়েই তিনি মানুষকে জাগাবেন। তিনি ভাগবতের কথা স্মরণ করে বললেন : পরমেশ্বরের প্রেম, সকলের জন্য বন্ধুত্ব, মূর্খদের জন্য কৃপা এবং বিরোধীদের প্রতি উপেক্ষা দেখানোই সব দিক থেকে ভালো হবে। রামমোহন যখন প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃপার কথা বলেন তখন বুঝতে পারি মানুষের কথাই তিনি ভেবেছেন। ভেবেছেন অজ্ঞানতা থেকে কীভাবে মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। রামমোহন আলোকিত মানুষ।

রামমোহনের সহযোগী বন্ধুদের কথা বলা হয়েছে। এঁরা রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন নানাভাবে। সকলেই যে রামমোহনের সব মত মেনে নিয়েছেন এমন নয়। কিন্তু রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাকে এঁরা সমর্থন করেছেন। রামমোহন নানা সূত্রে বলেছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে এদেশে এমন এক শ্রেণীর মানুষের দেখা পাওয়া গেল যাঁরা সকল কাজে, চিন্তায় — প্রাচীন ভাবনা-চিন্তার যা এখন আর গ্রাহ্য নয় — তাকে বর্জন করতে উৎসুক। এই শ্রেণীর মানুষই রামমোহন চেয়েছিলেন। ওই শ্রেণীকেই বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এখানে আরও একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় রামমোহন যখন লিখতে আরম্ভ করলেন তখন বাংলা গদ্যের চর্চা খুব বেশি দূর এগোয়নি। মানুষ কাজেকর্মে কিছু গদ্যভাষা ব্যবহার করত ঠিকই। তাতে গদ্যের একটা চেহারাও ফুটে উঠেছিল। এরপরেই ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমুনশিরা বাংলা গদ্যে বই লেখেন ইংরেজদের জন্য। সেগুলি সবই পাঠ্য বই ছিল। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ যোগ ছিল না। রামমোহন লিখলেন সকলের জন্য। স্কুলে বা কলেজের পাঠ্য বই নয়। বাংলা গদ্যকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন রামমোহন।

তাঁর গদ্য প্রধানত তর্কের গদ্য। কীভাবে যুক্তিকে সাজাতে হয় রামমোহন তা জানতেন। রামমোহনের লেখা থেকে বুঝতে পারি সে সময়ের গদ্যে বিভিন্ন পদের অন্বয় ঠিকমতো হত না। তিনি লিখলেন ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তৃপদের যেন যোগটা সোজাসুজি হয়। অনর্থক বাক্যকে লম্বা করে এই সোজাসুজি যোগকে নষ্ট করা উচিত হবে না। রামমোহন তুলনামূলক ধর্মের সমালোচনা করেছেন। এর ফলে বাংলা গদ্যে বিষয়েরও নূতনত্ব দেখা দিল। তিনি যে বাংলা ভাষা নিয়ে গভীর চিন্তা করেছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বইতে।

৭

হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ যেমন রামমোহনের বিরোধিতা করছিলেন, তেমনি খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায়ও রামমোহনের প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন। রামমোহন এ ক্ষেত্রেও থেমে থাকলেন না। মিশনারিদের ধর্মমতে গোঁড়ামি আর ভুল কোথায় তা তিনি দেখিয়ে দিতে চাইলেন।

মিশনারিরা হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণ শুরু করেছিলেন আঠারো শতকেই। মানোএল দ্য আসুম্পসাঁও এবং দোম আন্তনিও হিন্দুধর্মকে পতিতের ধর্ম বলেছিলেন! রামমোহন প্রতিমাপূজার বিরোধী, মিশনারিরাও সেই মতে বিশ্বাসী। এক সময়ে রামমোহনের সঙ্গে এই কারণে মিশনারিদের বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন শ্রীরামপুরে মিশনারিদের মিশনে চলে যেতেন। তাঁদের প্রার্থনাসভায় যোগ দিতেন। মিশনারিরা এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। খ্রিস্টানধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে যে রামমোহনও বিশ্বাসী এই প্রচার তারা দেশময় ছড়িয়ে দিলেন। বিদেশেও তখন রামমোহনের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ-ই মিশনারিরা রামমোহনের প্রতি বিরূপ হলেন। ১৮২০ সালে রামমোহন *The Precepts of Jesus, Guide to Peace and Happiness* বইটি প্রকাশ করেন। ব্যাস, আগুনে যেন ঘি পড়ল। রামমোহন খ্রিস্টধর্মের সার সংকলন করেছিলেন এই বইতে। আর জোর দিয়ে বলেছিলেন বাইবেলের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং যীশুর ঈশ্বরত্বকে মেনে নেওয়া যায় না। আসলে রামমোহন তো ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো প্রেরিত পুরুষ সম্বন্ধে একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নাকচ করে দিলেন এসব জল্পনাকল্পনাকে। ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যার সময়েও তিনি পয়গম্বরত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। যাই হোক

মিশনারিদের আঘাতের উত্তরে রামমোহন জবাব দিলেন। কিন্তু জবাব মিশনারিরা ছাপলেন না। রামমোহন তো বসে থাকতে জানতেন না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Brahmunical Magazine প্রকাশ করে মিশনারিদের প্রতিবাদ করলেন। আর এক রকমের দ্বন্দ্ব বেধে গেল। রামমোহন কিছু বন্ধু হারালেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষিত কর্মচারীরা অবশ্য রামমোহনের গতিবিধির উপর লক্ষ রেখেছিলেন। তাঁরা সব সময়েই রামমোহনের মতামতকে সম্মান করতেন। তাঁদের কিছু কিছু সংস্কারের কাজে রামমোহনের সাহায্যও কাম্য ছিল। বাইবেলের অলৌকিক কাহিনী কিংবা যীশুর অবতারত্ব না মানলেও রামমোহন বাইবেল গ্রন্থের সত্যসন্ধান সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, যীশুর অসাধারণ চরিত্রবল এবং নৈতিক শক্তির প্রতি বিনম্র থেকেছেন। গোঁড়ারা ভুল বুঝলেন। প্রতিবাদ করলেন ডোকার স্মিড। রামমোহনের প্রতিবাদ পড়ে জোশুয়া মার্শম্যান জোরালো ভাষায় আক্রমণ করলেন রামমোহনকে। তারও উত্তর দিলেন রামমোহন। তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, বাইবেলের শিক্ষাদর্শন মানবসমাজের শান্তি রক্ষা করতে পারবে। মানুষকে বাইবেলের শিক্ষা ছোটো মন থেকে বড়ো মনে পৌঁছে দেবে। মানুষের সুখ ও শান্তিই বাইবেলের শিক্ষা। অথচ মার্শম্যান রামমোহনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করলেন। তবুও রামমোহন অবিচলিত। তিনি বারবার বললেন, তর্ক চালিয়ে যেতে তিনি রাজি কিন্তু সে তর্ক যেন হয় সুভদ্র। কে কার কথা শোনে। গোঁড়ারা রামমোহনের বিরুদ্ধে লেগেই রইলেন। সেই সময়ের নামী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' লিখেছিল মিশনারিদের তর্কে রামমোহন খুব সাবধানী ছিলেন, মন ছিল সতর্ক, প্রখর বুদ্ধির ঝলকানি, যুক্তির ছিল ক্ষুরের মতো ধার, তার সঙ্গে মিশেছিল ভদ্রতা। এঁড়ে তর্ককেও রামমোহন যুক্তির দ্বারা পরাজিত করেছেন। রামমোহন একথাও বলেছিলেন সর্বজনীন সহিষ্ণুতার মনোভাবই হিন্দুধর্মের মূলনীতি। কিন্তু কেবল এই কারণেই হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণকে প্রতিবাদ করছেন না। প্রতিবাদ করছেন একজন ধর্মতত্ত্ব আলোচকরূপে। খ্রিস্টানরা যে তিনজন ঈশ্বরের কথা বলেন

যেমন গড, যীশু ও হোলি গোস্ট, রামমোহন তাঁর তীব্র সমালোচনা করলেন। একেশ্বরবাদই যে বাইবেলের ধর্ম একথা তিনি জোর দিয়ে বললেন।

তিন ঈশ্বরে বিশ্বাসীকে নিয়ে রামমোহনের একটি ছোটো নাটকের খানিকটা এখানে আমাদের ভাষায় তুলে দিই :

পাত্র : তিনজন চীন দেশের শিষ্য এবং পাদরি।

পাদরি — ঈশ্বর এক না অনেক?

প্রথম শিষ্য — ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য — ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য — ঈশ্বর নেই।

পাদরি — (হতাশ) হায় হায় তোমরা শয়তানের কাজ করলে।

তিনজন শিষ্য একসঙ্গে — আপনি তো এরকমই শিখিয়েছিলেন।

পাদরি — ওহে তুমি যে তিন জন ঈশ্বরের কথা বলছ, তা আধাআধি সত্য। মনে রেখো তিন জন মিলে এক ঈশ্বর।

প্রথম শিষ্য — আমরা চীন দেশের লোক। তিনকে এক করতে জানি না।

পাদরি — তুমি মূর্খ! ওহে দ্বিতীয় শিষ্য, তুমি ঈশ্বর দুই বললে কেন?

দ্বিতীয় শিষ্য — আপনি যে বলেছিলেন, তিন জনের মধ্যে একজন পশ্চিমে গিয়ে মারা গেছেন। তাহলে তো থাকে দু'জন।

পাদরি — মূর্খ! ওহে তৃতীয় শিষ্য, তুমি কী মনে করে বললে ঈশ্বর নেই?

তৃতীয় শিষ্য — আমি আপনার কথা শুনে বুঝেছিলাম ঈশ্বর এক।

পাদরি — *তাহলে তুমি ঈশ্বর নেই বললে কেন?*

শিষ্য — *(হাতে একটা কিছু নিয়ে) দেখুন আমার হাতের এ বস্তুকে যদি অন্য জায়গায় সরিয়ে দিই তাহলে আমার হাতে কিছু নেই।*

পাদরি — *এখানে এরকম যুক্তি কী করে আসে?*

শিষ্য — *আপনি বলেছিলেন যীশুই ঈশ্বর। তিনি তো আজ থেকে ১৮০০ বছর আগেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তাহলে তো সাব্যস্ত হল ঈশ্বর নেই।*

পাদরি — *তোমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করব। কিন্তু জানবে. যতদিন বাঁচবে ততদিন কেবল যন্ত্রণা পাবে।*

রামমোহনের রসিকতার দৃষ্টান্ত এটি? নাকি গোঁড়াদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ? কেন যে মিশনারি সম্প্রদায় এবং গোঁড়া খ্রিস্টানরা রামমোহনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রায় একসঙ্গে রামমোহনের বিরোধী হয়ে উঠলেন। কলকাতা শহর যে তখন এই তর্কযুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামমোহনের আত্মীয়সভাও খুব বেশিদিন চলল না। এই সময়েই তিনি পেয়ে গেলেন ইংরেজ বন্ধু অ্যাডামকে। তাঁর সঙ্গে মিলে তিনি তৈরি করলেন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' (১৮২১)। রামমোহন জানতেন তাঁর চিন্তাধারা সাতসমুদ্র পেরিয়ে গেছে। থোরো এবং অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাঁর লেখায় মুগ্ধ হচ্ছেন। অনেককাল পরে রামমোহনের সেই 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' সম্পর্কে এম. ডি. কনওয়ে এমন পর্যন্ত বলেছিলেন যে, এই হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাবিদের জুড়ি খ্রিস্টান জগতেও মেলা ভার। রামমোহনের এই সভা এতই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল যে বিলেতে অনুষ্ঠিত সভায় ফ্রান্স আর ট্রানসিলভেনিয়া থেকে একেশ্বরবাদীরা

রামমোহনের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। আর এসেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বার্কল্যাণ্ড। এই সব ঘটনার সূচনা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডেই। এখানে রামমোহন তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদ, কয়েকজন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুজন শিষ্যকে নিয়ে এই সভায় যেতেন। অ্যাডাম ছিলেন রামমোহনের যথার্থ সহযোগী। গোঁড়া খ্রিস্টানরা অ্যাডামকে ধর্মচ্যুত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। এ যেন একদা মার্টিন লুথারের মতো খ্রিস্টধর্মের অন্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অ্যাডাম রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন, রামমোহনের মনে ছিল স্বাধীনতার জন্য ভালোবাসা। মনের রাজ্যে তিনি মুক্ত পুরুষ থাকতে চেয়েছিলেন। রামমোহন দেশাচার, বংশ, ব্যক্তিগত পদাধিকারের সকল বাধা ছিঁড়ে ফেলে পায়ে মাড়িয়েছিলেন। রামমোহন চেয়েছেন বিশ্বাত্মবোধক একটি ধর্মকে। হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের সত্যকে সন্ধান করেছিলেন তিনি এবং তিনি সফলও হয়েছিলেন তাঁর নিজের মতো করে। দেশের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি। অ্যাডামের মতো আরও ধার্মিক, রাজনীতিক এবং বিদ্বানের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন রামমোহন। খ্রিস্টানদের অকথ্য গালাগালির উত্তরে রামমোহন বলতে পেরেছিলেন 'ঈশ্বর ধর্মকে সেই শক্তি দিন যাতে মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদের মনোভাবের শেষ ঘটিয়ে তা মানবজাতির শান্তির ও ঐক্যের উপযোগী হয়'। এই হচ্ছে বিশ্বজনীন ধর্মের সত্য।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব একদিন প্রস্তাব করলেন, অন্যের ধর্মসভায় না গিয়ে তাঁদের একটি নিজস্ব ধর্মসভা হোক। রামমোহনের মনে ধরল এই প্রস্তাব। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সভা স্থাপন করলেন। নাম দিলেন 'ব্রহ্মসভা'।

১৮২৮ সালে সে ব্রহ্মসভা স্থাপিত হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় সভা আরম্ভ হত এবং ৯টা পর্যন্ত তা চলত। একজন হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ বেদ, উৎসবানন্দ বেদান্তবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করতেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর ছোটো ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের

ব্যাখ্যা করতেন। তারপর গান। গান করতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, গোলাম আব্বাস পাখোয়াজ বাজাতেন। রামমোহন বিষ্ণু চক্রবর্তীর সংস্কৃত শ্লোকের সুরসংযোগে সংগীত শুনতে ভালোবাসতেন। সেই সূত্রেই রামমোহন তাঁর নিজের রচিত গানে ধ্রুপদী সুরের ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। এ গানের মেজাজমর্জি ছিল তখনকার বাংলা গান থেকে কিছুটা আলাদা।

ব্রহ্মসভা পাকাপাকিভাবে ১৮৩০ সালে নূতন বাড়িতে উঠে এল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হলেন আচার্য। এই সভায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জন্য খোলা ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য হল — প্রাণীহিংসা চলবে না, পানভোজন হবে না, জীব এবং জড়ের কারও উপাস্যকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা চলবে না। প্রেম-নীতি-ভক্তি-দয়া-সাধুতা-র উন্নতিই সভার লক্ষ্য হবে। মূর্তিপূজা চলবে না। লোকের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের প্রয়াস চালাতে হবে। বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা-সংগীতের লক্ষ্যই থাকবে সেই দিকে। আত্মীয়সভাতেই রামমোহনের রচিত সংগীত গাওয়া হত : 'কে ভুলাল হায়/কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়/আপনি গড়ছ যাকে,/যে তোমার বশে তাঁকে/কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?/কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;/ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।/প্রভু বোলে মান যারে,/সম্মুখে নাচাও তারে —/হেন ভুল এ সংস্কারে দেখেছ কোথায়?' পাঁচালি, কীর্তন, রামপ্রসাদী গানের ধারায় নূতন একটি প্রবাহ যুক্ত হল, যার নাম ব্রহ্মসংগীত।

৮

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। তাঁর যুদ্ধ ছিল কলমের সাহায্যে। তিনি প্রকাশ করলেন খবরের কাগজ। দুবছরের মধ্যেই তিনখানি কাগজ বার করলেন। এদের নাম ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন — ব্রাহ্মণসেবধি, সম্বাদ-কৌমুদী আর মিরাৎ-উল্-আখ্বার। প্রথমটির ভাষা ইংরেজি-বাংলা, দ্বিতীয়টির বাংলা এবং তৃতীয়টির

ফারসি। আমরা বুঝতে পারছি রামমোহন সকলের কাছে যেতে চাইছেন। সেজন্য তিনটি ভাষায় কাগজ প্রকাশ করলেন। খবরের কাগজ পড়ে কেউ রামমোহনের বিরুদ্ধে চটে গেলেন, কেউ খুশি হলেন, কেউ বা রামমোহনের স্পর্ধা দেখে আইন করে শাসন করতে চাইলেন রামমোহনকে।

রামমোহন কি চুপ করে থাকার মানুষ! যেই দেখলেন ইংরেজ তার কাগজ বন্ধ করবার জন্য ফন্দিফিকির করছে, অমনি তিনি মিরাৎ-উল-আখ্‌বার কাগজ বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের রক্তচক্ষু ফুটে উঠল। তিনি বললেন খবরের কাগজ বার করতে হলে পুলিশের কাছে হলফনামা দিতে হবে। আর সেক্রেটারির কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে।

রামমোহন এ অপমান সহ্য করলেন না। তাঁর রাগ ফেটে পড়ল। কিন্তু ঐ যে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন ভদ্র। কটুকাটব্য ভদ্রভাষাতেই করতেন। ইংরেজের হুমকিকে প্রতিবাদ করে রামমোহন বলেছেন, লাইসেন্স তো পাবে তাঁরা যাঁরা ইংরেজদের প্রিয়পাত্র। তাঁর পক্ষে দারোয়ান চাকরের ভিড় ঠেলে সাহেবের কাছ থেকে লাইসেন্স জোগাড় করা সম্ভব নয়। আর তিনি যাবেনই বা কেন। তাঁর তো সম্মান আছে। এই সম্মান দারোয়ান আর চাকরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারবেন না তিনি। আর তিনি যাবেন আদালতে! অতি নিন্দার কাজ হবে সেটা, নীচ যাঁরা তাঁরাই পারে এ কাজ করতে। আর, কে জানে, কর্তা ইংরেজ লাইসেন্স দিয়ে আবার কেড়েও নিতে পারে। সেটা কি লোকে ভালো চোখে দেখবে?

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন রামমোহন। ইংরেজের ক্ষমতাকে যেমন তিনি তোয়াক্কা করলেন না, তেমনি আবার, যাঁরা তাঁর কাগজ পড়ল তাঁদেরও বুঝিয়ে বললেন যে তিনি খোলা মনে যা বলতে চেয়েছেন তা যখন পারছেন না তার জন্য পড়ুয়ারা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। খবরের কাগজের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায় রামমোহনের কয়েকজন বন্ধু জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ করেন। পরে একেবারে খোদ মহারানী ভিকটোরিয়ার কছে প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন।

রামমোহন হ্যামিলটন সাহেবকে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি শিক্ষা দিতে চাইলেন আইনের কর্তা ম্যাকেনটনকে।

দেশ তো এইভাবেই প্রতিবাদে তর্কযুদ্ধে জেগে ওঠে। দেশবাসী নিজের মর্যাদায় নিজের ভবিষ্যৎ এইভাবেই গড়ে তুলতে চায়। বিদ্যাসাগরকে যখন টেবিলে পা উঁচিয়ে সাহেব অপমান করতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরও চটিজুতো সমেত টেবিলের ওপর পা রেখে সাহেবকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। এ আর কিছু নয়, 'অন্যায়কে মানব না, সে সাহেবই করুক আর দেশবাসীই করুক', এ হল এই মনোভাবের একটা প্রকাশ।

রামমোহন আত্মসম্মান খুইয়ে কোনো কাজই করতেন না। একবার গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁর দেহরক্ষীকে পাঠিয়েছেন রামমোহনের কাছে। দেহরক্ষী নমস্কার জানিয়ে বললেন — উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে চান। রামমোহন জানালেন বেন্টিঙ্কের সঙ্গে এখন দেখা করবার তার ইচ্ছে নেই। তিনি সাধারণ মানুষ, ধর্মকর্ম নিয়েই সময় কাটাতে ভালোবাসেন। রাজপুরুষের কাছে তিনি যেতে পারছেন না।

রামমোহন সাধারণ মানুষ কি না জানি না, অন্য কেউ হলে তক্ষুনি চলে যেতেন, বেন্টিঙ্কের আসার অপেক্ষা না করেই। কিন্তু বেন্টিঙ্ক বুদ্ধিমান, তিনি বুঝে ফেলেছিলেন রামমোহন দেহরক্ষীর কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার তিনি দেহরক্ষীকে পাঠালেন রামমোহনের কাছে। এবার বেন্টিঙ্ক বলে দিয়েছিলেন — দেহরক্ষী যেন বলে, রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে পারলে বেন্টিঙ্ক খুবই খুশি হবেন। রামমোহন রাজপুরুষের ডাকে যাননি কিন্তু বেন্টিঙ্কের বন্ধুভাবে ডাকে সাড়া দিলেন।

এ শক্তি রামমোহন পেলেন কোথা থেকে? আমরা তো বলব তিনি নিজেই এ শক্তি অর্জন করেছিলেন নিজেরই সাধনায়।

একবার এক পাদ্রিকে রামমোহন উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। সে কথা বলি। বেন্টিঙ্কের মতো মন তো সব ইংরেজের ছিল না। পাদ্রিরা এদেশের মানুষকে মনে করতেন পতিত বলে। কেউ বা ভাবতেন ভারতবর্ষ হচ্ছে মন্ত্রতন্ত্র ভূতপ্রেতের দেশ। এদের উদ্ধার করতে হবে। খ্রিস্টধর্মে এদের দীক্ষা দিয়ে পরিত্রাণ করতে হবে। কিন্তু ভারতবাসী তা

মানবে কেন? অনেকেই পাদ্রিদের ধারেকাছেও যেতে চাইতেন না। পাদ্রিরা ভাবলেন যদি কিছু বড়ো বড়ো মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া যায় তবে ভারতের অনেকেই ধীরে ধীরে খ্রিস্টান হয়ে যাবে। পাদ্রিরা এও বুঝেছিলেন, ভালো কথায় সকলকে রাজি করানো যাবে না। বড়ো চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে, ঠুনকো সম্মান দিয়ে বড়োলোকদের টানবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল রামমোহনের দিকে। রামমোহন ইংরেজদের সঙ্গে মেশেন, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, সুতরাং পাদ্রি মিডলটন ভাবলেন সহজেই রামমোহনকে বশে আনা যাবে। ধর্মান্তরের সঙ্গে টোপ দিলেন যে, খ্রিস্টান হলেই রামমোহন টাকাপয়সা, বড়ো বড়ো ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনো বড়ো পদ, মান-সম্মান সব পেয়ে যাবেন। লোভ দেখাচ্ছেন পাদ্রি? রামমোহনের সেই শক্তি গর্জে উঠল। তিনি মিডলটনের বাড়ি থেকে ঘৃণায় বেরিয়ে এলেন, আর কোনোদিন সে বাড়িতে যাননি।

৯

নবাবি আমল শেষ হয়ে ইংরেজের শাসন আরম্ভ হয়ে গেছে। দেশে জ্ঞানচর্চা তখন সাবেককালের পথ ধরেই এগোচ্ছে। রামমোহন নিজে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন। আরবি-ফারসি আর সংস্কৃত জানাই ছিল তখন আভিজাত্যের লক্ষণ। রাজদ্বারে এই দুই ভাষার প্রতিপত্তিই তখন চলছে। মান্যগণ্য মানুষের শিক্ষা এই দুই ভাষার অধিকারের উপর নির্ভর করছে। কাজি অথবা চণ্ডীমণ্ডপ তখনও বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালত। তার ভাষাও সংস্কৃত অথবা আরবি-ফারসি। বাংলা ভাষার কদর নেই এ কথা বলব না। তবে তা খুব সাধারণের প্রাত্যহিক কাজকর্মের জন্যই। সে ভাষা তখনও শিক্ষিত বাঙালির কাছে তেমন মর্যাদা পায়নি।

রামমোহন এ শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন চাইছিলেন। নূতন কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, সেখানে নূতনত্বের ছিটেফোঁটাও যে ছিল না এমন নয়। কিন্তু স্কুল-প্রতিষ্ঠাতাদের মাথায় ছিল ব্যাবসা করা। বেশি ফি নিয়ে

কিছু অপোগণ্ড তৈরি করে দেওয়া। দু'পাতা ইংরেজি জানা ছাত্র একেই বলে। আর একথা তো মানতেই হবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কী দায় পড়েছে শিক্ষা-সংস্কারের! তবে মন্দের ভালো এই ছিল যে সাহেবদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশের কিছু উন্নতি চাইতেন। কেউ কেউ তো এও বুঝেছিলেন যে ভারতকে যত পচাগলা ভূতপ্রেতের দেশ বলে বিদেশে জানুক না কেন, এদেশের ভাষা তাদেরই সগোত্র। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোনস তাই প্রমাণ করেছিলেন। শিক্ষা-সংস্কারেও তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতামত দিয়েছেন, সংস্কার কাজে এগিয়ে এসেছেন।

রামমোহন বুঝেছিলেন মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থা পালটাতে হবে। দেশের তরুণদের মধ্যেও ভালো ইংরেজি শিক্ষা লাভের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। কিছু সাহেবসুবোও তাই চেয়েছিলেন। রামমোহন ইংরেজি শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঠিক করল কলকাতায় একটি কলেজ করবে। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এলেন। তাঁকে সমর্থন জানালেন রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর। আরও অনেকে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এলেন। ১৮১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এডোয়ার্ড হাইড্ ইস্ট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর বাড়িতে একটি সভা ডাকলেন। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় আমন্ত্রিত হলেন। রামমোহনের সমর্থকরা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু বিরোধীরাও সংখ্যায় কম ছিলেন না। রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, মতিলাল শীল প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত। রামমোহন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

কলেজ প্রতিষ্ঠা হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। চাঁদা তোলার কথা হল। আর কলেজের পরিচালনা-সমিতি গঠন করবারও প্রস্তাব এল। এ সমিতিতে থাকবার জন্য রামমোহনের নাম বোধ করি কেউ তুলেছিলেন। আর এই নিয়েই ধুন্ধুমার বেধে গেল। বিরোধীরা বললেন কলেজের কোনো ব্যাপারেই রামমোহনের নাম থাকতে পারবে না। যদি থাকে তাহলে তাঁরা কেউ এই কলেজের ছায়া মাড়াবেন না।

বিদেশী হাইড্ ইস্ট তো অবাক। আলোচনা হচ্ছে তো শিক্ষার ব্যাপারে। এখানে ব্যক্তিগত ঝগড়া টেনে আনা হচ্ছে কেন? চণ্ডীমণ্ডপের ঘোঁট একেই বলে। বিরোধীদের আপত্তিটা কোথায়? রামমোহন হিন্দু-বিদ্বেষী, তিনি যবন। তাঁর সঙ্গে একত্রে বসা যায় না।

এরপর কি রামমোহন চোগাচাপকান পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন? থাক এখন সেসব কথা।

হাইড্ ইস্ট কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, তিনি তো খ্রিস্টান —

এবং বেশিমাত্রায় খ্রিস্টান! তিনি যদি এই কলেজের জন্য কিছু টাকা দেন, তাঁরা নেবেন তো? বিরোধী পক্ষ বললেন হাইড্ ইস্টের টাকা অবশ্যই তাঁরা নেবেন, কিন্তু রামমোহনের? নৈব নৈব চ।

রামমোহন শুনলেন। তিনি ইচ্ছে করলেই এই কলেজের পরিচালন-সমিতিতে আসতে পারতেন। কিন্তু না, শিক্ষাসংস্কার আর শিক্ষার উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। দেশ তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো। তিনি সরে দাঁড়ালেন। একটা চারাগাছকে তিনি মারতে দিলেন না। অথচ রামমোহন এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কত পরিশ্রম করেছেন। উৎসাহ নিয়ে কত পরিকল্পনা করেছেন। উপকারীর প্রতি এই ব্যবহার তো স্বাভাবিক। কষ্ট হয়ত হবে কিন্তু দেশ বাঁচুক। নূতনের কেতন উড়ুক।

রামমোহনকে বাদ দিয়েই রামমোহনের স্বপ্ন সফল হল। তৈরি হল 'বিদ্যালয় মহাপাঠশালা'। পরে 'হিন্দু কলেজ'। আরও পরে নাম হল 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'।

রামমোহন প্রায় একার প্রচেষ্টাতেই আর একটি স্কুল গড়ে তুললেন। ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য রামমোহনের তখন অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তিনি স্কুলের নাম দিলেন 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল'। কিন্তু ছাত্র কই!

নিজের ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন। নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়ণ এই স্কুলে ভর্তি হল। দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এলেন। এদিক সেদিক থেকে আরও কিছু ছাত্র জুটে গেল। তাই সই। তাঁদের কাছেই শুরু হল রামমোহনের ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের পাঠদান। আর হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের মিলনের বাণী এখানে উচ্চারিত হল বারবার।

একটি-দু'টি দিয়ে শুরু। কিন্তু আরও চাই। আরও স্কুল গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে কী করে? নূতন কালের কথা শোনাতে হবে সকলকে। মানুষ অঞ্জলি ভরে তুলে নিক সে শিক্ষাকে। বিদ্যাসাগর তখনও দূরে। সেই দূরকে কাছে আনতে গেলে পথ তৈরি করে দিতে হবে। তখন তৈরি হবে রাতারাতি দশ-পঞ্চাশ-একশো স্কুল।

কলকাতায় চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রধান বিশপ রেভারেণ্ড ব্রাইস

রামমোহনের বন্ধু। রামমোহন ব্রাইসের সঙ্গে শিক্ষাপ্রসারের বিষয়ে আলোচনা করলেন। স্কটল্যাণ্ড থেকে ব্রাইস ডেকে আনলেন আলেকজাণ্ডার ডাফকে।

ডাফ তো এলেন। কিন্তু স্কুল তৈরি করবার বাড়ি খুঁজে পান না। ডাফ তো খ্রিস্টান। তাঁকে বাড়ি ভাড়া দেবে কে? ডাফের সম্পর্কে কারও কারও ভয়ও ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেকথা বলেওছেন। যদি ডাফ সকলকে খ্রিস্টান করে দেন? ডাফ বাড়ি পান না। মহাভাবনায় ডাফ।

রামমোহন এগিয়ে এলেন। তিনি বাড়ি জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু ঐ যে বলেছি খ্রিস্টান হয়ে যাবার ভয়। স্কুলে ছাত্র ভর্তি হয় না। কাকে পড়াবেন ডাফ? ডাফ আবার শরণ নিলেন রামমোহনের। মুস্কিল আসান হল। রামমোহন অনুরোধ করলেন, বোঝালেন অভিভাবকদের। ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। তারপর তো বর্ষে বর্ষে দলে দলে ছাত্র এবং পরে ছাত্রী। সেই স্কুলই পরে হল স্কটিশচার্চ কলেজ। রামমোহন পরাজয় মানতেন না। এক্ষেত্রেও তিনি দিগ্বিজয়ী। রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে কেন যে এতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন তা ভেবে দেখার মতো। দেশে অন্ধকার চারদিকে। এই অন্ধকারকে দূর করতে হলে ইংরেজি শিক্ষা চাই। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সংস্কারমুক্ত করবার পথ ইংরেজি জ্ঞান।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। কাশীতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতাবাসীরও ইচ্ছা এখানে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হোক। গভর্নমেন্ট সংস্কৃত পণ্ডিতদের নিয়ে কলেজ-প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করলেন। রামমোহন বিচলিত হলেন। তিনি লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পাঠালেন। এ প্রতিবাদ-চিঠিটি রামমোহনকে জানবার দিক থেকে খুব মূল্যবান। রামমোহন জানান, সংস্কৃতশিক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে একজন মানুষের পুরো জীবনটাই কেটে যায়। এই সময় দিলে শিক্ষা কতটা এগোবে? আর সংস্কৃত ব্যাকরণ? তার খুঁটিনাটি জানতে হলে, সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ্‌রাই বলেছেন, বারো বছরের কমে তা সম্ভব নয়। এ বোঝা ছাত্রদের বইতে হলে শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব।

আরও একটা বিশ্বাসে রামমোহন ঘা দিলেন। তিনি বললেন, বেদান্ত, মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা খুব যে উপকারে লাগবে তাও মনে হয় না। সংস্কৃত শিক্ষা দেশের লোককে অন্ধকারেই রেখে দেবে।

এখন প্রয়োজন — কেবল তত্ত্ব নয় -- কাজে লাগবে, পথ চলতে সাহায্য করবে এমন জ্ঞান। যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে ইউরোপ যে এত উন্নত হতে পেরেছে তার কারণ তো এই যে, এসব বিষয়ের উপর সে অধিকারলাভ করেছে। অতএব, এখানেও শেখানো হোক এই সব জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ।

কাশীর পণ্ডিত হয়তো রামমোহন নন। কিন্তু সংস্কৃতভাষা-বিশারদ তো রামমোহন। তিনি বেদান্তের আলোচনা করেছেন। অথচ এর পঠন-পাঠনের উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এই চিঠিতে। অবাক হবার মতোই কথা। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার দুরূহতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেজন্য বারো বছরের বিদ্যাশিক্ষাকে কত অল্প সময়ে লাভ করা যায় তার জন্য বিদ্যাসাগর নিজেই লিখলেন উপক্রমণিকা। রামমোহন কি এরকমই কিছু চেয়েছিলেন?

১০

রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্পের মহামায়াকে মনে পড়ে? যাকে রাজীব বিয়ে করতে চেয়েছিল? মহামায়ার বাবা একদিন দেখে ফেললেন রাজীব আর মহামায়াকে একসঙ্গে। তাঁর সন্দেহ হল। সেই রাত্রেই, কাল যে বুড়ো মরবে, মহামায়াকে চেলী পরিয়ে বাপ বিয়ে দিয়ে দিলেন তার সঙ্গে। বুড়ো মরে গেল। বুড়োর চিতায় মহামায়ার হাত পা বেঁধে উঠিয়ে দেওয়া হল। আগুন জ্বলে উঠল। মহামায়া আর্তনাদ করে উঠল। আগুনে হাতের বাঁধন পুড়ে গেল, পায়ের বাঁধন খুলে চিতা থেকে সে বেরিয়ে এল। মুখ ঝলসে গেছে। সুন্দরী মহামায়া কুৎসিত রূপ নিয়ে এল। দগ্ধ মহামায়া সংসার থেকে মুছে গেল একদিন।

এই আমাদের সতীদাহ। মহামায়া উঠে আসতে পেরেছিল। কিন্তু

কত হতভাগিনীর শেষ চিৎকার যে আগুনের শিখায় শেষ হয়েছে, তারও কিছু ইতিহাস জানা আছে অনেকের। যন্ত্রণায় যখন সে নারী চিৎকার করে উঠেছে তখন ঢাকঢোল বাজিয়ে সে চিৎকারকে শুনতে দেওয়া হয়নি। ব্রাহ্মণ পুরোহিত চিতার পাশে। হয়তো মেয়ের বাপ মা সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু সকলেই মেনে নিচ্ছেন নারীর এই পরিণামকে। স্বর্গলাভ হবে সতীর।

মেনে নিতে পারলেন না রামমোহন। তিনি যেমন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তেমনি বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন এই স্বর্গকামনা আসলে নারীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। সমাজের এই পাপকে দূর করতেই হবে। দূর করতে হলে চাই শাস্ত্রবিচার। শাস্ত্র আলোচনা করেই বোঝাতে হবে — এ অন্যায়, এ পাপ।

রামমোহন দেখলেন, এ জঘন্য প্রথার বিরোধী মানুষ দেশে আছেন, তাঁরা প্রতিবাদও করেছেন। কোনো সতী যদি নিজের ইচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে চায় তাতে কিছু বলবার নেই। কে যেতে চায় আগুনে ঝাঁপ দিতে? জোর করে, বেঁধে, বাঁশ নিয়ে আঘাত করে,

পুড়িয়ে মারাই ছিল সহজ কাজ। আর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মিশনারি এবং লর্ড ওয়েলেসলি স্বয়ং এই প্রথা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করলেও দিনের পর দিন তা বেড়েই যাচ্ছিল। ১৮১৫ সালে ২৫৩ জন, ১৮১৬ সালে ২৮৯, ১৮১৭ সালে ৪৪২ এবং ১৮১৮ সালে ৫৪৪ জন সতী হয়েছিল। এটা তো সরকারি হিসেব। গ্রামে গঞ্জে আরও কত অসহায় নারী সতী হয়েছিল তার হিসেব কে দেবে। তবে এই হিসেবই যথেষ্ট।

মেয়েদের কি আমরা মানুষ মনে করেছি? পুড়িয়ে মারার প্রয়োজন কেন? মেয়েরা নীচু তলার জীব, তারা মূর্খ, তারা দুর্বল, তাদের বিশ্বাস করা যায় না, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই বললেই চলে। বিধবা হয়ে বেঁচে থেকে তাদের কী লাভ? তাদের পুড়ে মরাই উচিত। অবাক হয়ে যাই সেকালের কিছু কিছু মানুষের এই ধারণা দেখে। আবার এও ভাবতে হয়, একালেই তো রূপ কানোয়ারের মতো মেয়েকেও বাধ্য হয়ে সতী হতে হয়েছিল। আর সে দৃশ্য দেখার জন্য কিছু কিছু মানুষের সে কী উৎসাহ!

রামমোহন ছিলেন বিশেষভাবে নারীদরদী। বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি নারীর দুঃখে অশ্রুসজল। তিনি শাস্ত্রবিচার করে দেখাতে চাইলেন, নারীর সতী হবার বিধান নেই। লিখলেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), দ্বিতীয় গ্রন্থ ঐ নামেই লিখলেন ১৮১৯ সালে। ১৮২৯ সালে লিখলেন 'সহমরণ বিষয়'। সমাচার-দর্পণ পত্রিকা প্রথম বইটির সম্বন্ধে লিখল — রামমোহন প্রমাণ করেছেন যে ঠিকঠাক বিচার করলে শাস্ত্রে সহমরণ বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না।

রামমোহনের এই শাস্ত্রবিচারের অল্পকালের মধ্যেই এদেশে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। ইনি রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে মতামত জানলেন। ওদেশেও এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমত ছিল। নিজেও যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি রামমোহনের সহযোগিতা চাইলেন যাতে এই প্রথাকে আইন করে বন্ধ করা যায়। রামমোহনও বেন্টিঙ্ককে এবং অন্যান্যদের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করলেন।

তাঁর মতামতের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে তিনি সতীদাহকে কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসেবে দেখেননি। নারীর অধিকারহরণের সঙ্গে

এর যোগ রয়েছে। তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে বললেন, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নারীর ন্যায্য অধিকারকে পুরোপুরি স্বীকার করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস সকলেই বলেছেন স্বামীর মৃত্যুর পর মা তার ছেলেদের সঙ্গে সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে। এমনকী মনুও তাঁর 'দায়ভাগ' গ্রন্থে নারীর অধিকারকে স্বীকার করেছেন। স্বামী জীবিত অবস্থায় উইল করলে তিনি স্ত্রীকেও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না — এই হল দায়ভাগের বিধান। রামমোহন দেখিয়েছেন, মনু কিন্তু সৎ-মাদের অধিকারের কথা কিছু বলেননি।

রামমোহন বিচার করে দেখিয়েছেন, স্ত্রীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল। একমাত্র পুত্র থাকলেও মা সম্পত্তির কিছুই পাবে না। পুত্রের পুত্ররা সম্পত্তি পেতে পারে কিন্তু মা কিছুই পাবে না। মাকে পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ছেলে দিলে ভাত-কাপড় পাবেন, না দিলে উপোস। পরিণাম, দাসী হয়ে থাকা। সৎ-মায়ের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা একশোর উপরও হতে পারে) কথা তো কিছুই নেই শাস্ত্রে।

বঞ্চনা আর বঞ্চনা। নারী কিছুই পাবে না। এর পরিণাম? দেখা যাবে, একদিন যিনি ছিলেন গৃহের কর্ত্রী, কিছুদিন পরে তিনি ঘরের দাসী। অথবা, কারও আশ্রয়ে চরম কষ্টে দিনযাপন করবেন তিনি। বদমাইশ, জোচ্চোর ছেলেরা তাদের মা-এর উপর অত্যাচার করতেই পারে। সতীদাহের কারণও এই বঞ্চনা। কোনো ধর্মীয় কারণে সতীদাহ হয়নি। পুত্রের কাছে লাঞ্ছনা, ননদিনীর কাছে গঞ্জনা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা এগুলিই নারীকে অনেকসময়ে বাধ্য করেছে সতী হতে।

রামমোহন শিক্ষিত বাঙালিকে এবারে দেখালেন বহুবিবাহের কী পরিণাম। হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণেরা নির্বিচারে একের পর এক বিয়ে করে গেছে। তুচ্ছ কারণেও এরা ঘরে স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করত। প্রায়ই তাদের বর্বর ক্ষুধা মেটাবার জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ত। এর ফলে বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর ক্রীতদাসীর জীবন কাটাত, বাধ্য হয়েই বাঁচবার জন্য নারীরা অন্য পুরুষের সাহায্য চাইত। কুপথে যেতেও সমাজ বাধ্য করত। আর তৃতীয় পথ হল স্বামীর চিতায় উঠে জীবন-

বিসর্জন। লজ্জার বিষয় হল, এই বিসর্জনকে আত্মীয়স্বজনেরা মহান মৃত্যু ধরে নিয়ে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠত। কত নারী যে আত্মহত্যা করেছে তার সংখ্যা কে জানে। রামমোহন জানিয়েছেন বাংলাদেশেই (সেসময়ের বঙ্গদেশ) এই আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। যারা সতীদাহ শাস্ত্র-অনুমোদিত বলতেন, তাঁদের রামমোহন যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন, এ একেবারে মিথ্যা বিশ্বাস। আশ্চর্য হতে হয় ঐ সময়েই রামমোহন শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন পণপ্রথা হিন্দু নারীর দুর্দশার বিষময় পরিণাম ঘটায়। মেয়ের বাপের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় ছিল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এখনও সেই ট্র্যাডিশন চলছে, তা আমরা জানি।

রামমোহন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন, এসবের থেকে নারীর মুক্তি যেন হয়। রামমোহনের এই ব্রতকে সর্বনাশা বলে ক্ষেপে উঠলেন প্রতিপক্ষ। তাঁরা কোমর বাঁধলেন।

বেন্টিঙ্ক এই সময়ে এদেশে এলেন। রামমোহনের লেখা পড়েই শুধু নয়, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি ঠিকই করলেন, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আইন করতেই হবে।

রক্ষণশীল সমাজের তখন সামাল সামাল অবস্থা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় এই আইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখা চলতে লাগল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা স্বার্থপরতার নির্লজ্জ আস্ফালন। বেন্টিঙ্ককে তারা আর্জি জানালেন, ও পথে তিনি যেন না যান। হিন্দুর হিন্দুত্ব যেন বেন্টিঙ্ক চুরমার করে না দেন। অন্যদিকে রামমোহনের সমর্থনে এগিয়ে এলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। রামমোহনের আপনার জনেরা তো ছিলেনই। কলকাতার বুকে আবার দেখা দিল ঝড়। এমন ঝড় পরেও আবার এসেছিল যখন বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে আইনের দ্বারা সিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে প্রগতি আন্দোলন ওইভাবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। নারীর ভাগ্য-জয়ের পথ এইভাবেই প্রশস্ত হচ্ছিল।

রক্ষণশীলরা হেরে গেলেন। রামমোহন জয়ী হলেন। ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল।

হিন্দুসমাজের রাজা-মহারাজা, ভাটপাড়ার পণ্ডিত, এঁরা সবাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। আটশো সই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা। তাতেও যখন আইন পাশ হয়ে গেল তখন বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আর্জি জানাও। প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছিলেন সেদিন রাধাকান্ত দেব, মহারাজা গোপীকৃষ্ণ, হরনাথ তর্কভূষণ, দেওয়ান রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ 'স্বধর্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ' ধর্মসভা স্থাপন করে রামমোহনের প্রতিবাদে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সভার জন্মই হয়েছিল সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য। নাস্তিকদের শাস্তিদানও ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। রামমোহনের ব্রহ্মসভা অবশ্য এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮২৮)। এই সভার উপাসকদেরই বোধ হয় নাস্তিক বলেছিল 'ধর্মসভা'।

প্রিভি কাউন্সিলে কাকে পাঠানো যায়? ধর্মসভা ঠিক করে ফেলল অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে পাঠাবে। তার জন্য টাকা চাই। সৎ কাজে টাকা পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু এ কাজে চাঁদা এসে গেল বিশ হাজার টাকা।

জোর-জুলুম করেও চাঁদা আদায় করা হল। এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। রামমোহনকে খুন করবার জন্যও গুণ্ডাবাহিনী নেমে পড়ল। গুণ্ডারা রামমোহনের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। রামমোহন কী আর করবেন! তাঁকে সর্বোচ্চ রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা কে করে দেবে? রামমোহন নিজের সঙ্গেই রাখতেন একখানা গুপ্তি। তাঁর মনের বল ছিল প্রচণ্ড আর শরীর ছিল অসম্ভব রকমের ভালো। তাঁর বাড়ির চারদিকে কদর্য ভাষায় গান গাওয়া হত '*জাতের নিকেশ রামমোহন রায়/বিয়ের নিকেশ করেছে*'। রামমোহন এসব গায়ে মাখলেন না। কিন্তু সতর্ক হলেন। পুলিশের সাহায্য তাঁকে নিতেই হল।

এদিকে 'ব্রহ্মসভা'-র দলও চুপ করে থাকলেন না। তাঁরা রামমোহনকে বিলেতে পাঠাবার জন্য ব্যবস্থা করলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। আর যে সময় নেই। বেথি বিলেত রওনা হয়ে গেছেন। রামমোহন বন্ধুর বদান্যতায় খুশি হলেন কিন্তু টাকা নিলেন না। ব্রহ্মসভাকে সে টাকা দান করলেন। যাবেন যদি নিজের টাকাতেই যাবেন।

কিন্তু রামমোহনের হাতে তখন অত টাকা নেই। রামমোহন যখন টাকার ব্যাপারে কিছুটা চিন্তিত তখন হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসন প্রায় স্থায়ী করে ফেলেছে তখন। কিন্তু দিল্লিতে ছিলেন একজন বাদশাহ — দ্বিতীয় আকবর। দ্বিতীয় আকবর তার কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায়। অগত্যা তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে তাঁর হয়ে দরবার করবার জন্য একজন দূত পাঠাবেন বলে মনস্থ করলেন।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষে রামমোহনই তখন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। বুদ্ধিতে, সওয়ালে-জবাবে, ইংরেজি-বলিয়ে মানুষ আর কে আছেন তখন? দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলেতে পাঠাতে চাইলেন। রামমোহন সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বিলেতে যাবার তো তাঁর বহুকালের ইচ্ছে। সেখানেও তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা রয়েছেন। আর মনে পড়ছে কেবল তাঁর দাদার চিতায় বৌদির আরোহণ। সেই নিষ্ঠুর

ঘটনার তিনি সাক্ষী। কিছুদিনের মধ্যেই প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ বিলের আলোচনা হবে। সে সময় সেখানে তিনি থাকতে চান। যে ভাবেই হোক রক্ষণশীলদের নারীঘাতী নিষ্ঠুরতাকে বন্ধ করতে হবে, অতএব আর দেরি নয়।

রামমোহন বিলেত যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু রামমোহনকে 'রাজা' বলে স্বীকার করল না। বড়ো কর্তারা রামমোহনের বিলেত যাত্রায় বাদ সাধলেন। দিল্লির বাদশা তো নামেই আছেন, তাঁকে তারা মানেন না।

রামমোহন মেনে নিলেন কোম্পানির শাসন। কিন্তু বললেন, তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবে বিলেত যাবেন। দ্বিতীয় আকবরের দেওয়া উপাধি কোম্পানি গ্রহণ না করলেও নিপীড়িত মানুষের কাছে রামমোহন তখন মুকুটহীন রাজাই।

কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে অব্যাহতি পেলেও ক্ষুদ্রের আস্ফালন চলে যাবে কেন? বিরোধীরা বললেন রামমোহন বিলেত গেলে তাঁকে একঘরে করা হবে। এই হুমকি রক্ষণশীল সমাজ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত দিয়ে এসেছে। তাতে কি যাওয়া-আসা থেমেছে? রামমোহনও ভয় পাননি। রামমোহন আরও চিন্তা করেছিলেন। ভারতের হয়ে আরও অনেক কথা বলবার আছে ইউরোপকে, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে। ভারতের চিত্তদূত রামমোহন। বিলেতে ভারতের বার্তা পৌঁছে দিতে চান তিনি।

এদিকে ধর্মসভার প্রতিনিধি বেথির জাহাজ ডুবে গেল ঝড়ে। বেথি বেঁচে গেলেন কিন্তু কাগজপত্র ভেসে গেল। রামমোহন মুচকি হাসলেন।

১১

১৮৩০ সালে নভেম্বর মাসে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে চড়ে রামমোহন ইংল্যাণ্ড পাড়ি দিলেন। সঙ্গে গেলেন রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, পালিত পুত্র রাজারাম, দুজন চাকর রামহরি দাস আর শেখ বক্‌স।

ভারতবর্ষের মাটি থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলেও ভারতের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কথাই জাহাজে বসে রামমোহন

ভাবতেন। আর তিনি যুক্তিবাদী, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন; তাই সব কিছুই যুক্তির দ্বারা লিখবেন বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। জাহাজে তিনি সময় পেলেই সেইজন্য পড়তেন, লিখতেন। ইউরোপকে তিনি যা শোনাবেন, সে সবই ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলেন রামমোহন।

পড়া আর পড়া। এসব তো আমরা জানি। রামমোহনের সঙ্গে তন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে একবার এক পণ্ডিত তর্কে নেমেছিলেন। রামমোহন একদিন সময় চেয়েছিলেন। তন্ত্রের একটা বই তার পড়া ছিল না।

সেইদিনই শোভাবাজার রাজবাটী থেকে বইটি আনালেন। সারারাত্রি পরিশ্রম করে সেই কঠিন বই আয়ত্তে নিয়ে এলেন। এমনি ছিল তাঁর মেধা। বিলেতের পথেও রামমোহনের পড়ার গতি সেইরকমই ছিল। জাহাজে আলোচনা করবার জন্য তাঁর মনের মতো বন্ধু পেয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না।

সেকালে জাহাজে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লাগত। জাহাজ এসে পৌঁছল কেপ টাউনে। এখানে ছোটো একটা দুর্ঘটনা ঘটল। পড়ে গিয়ে রামমোহনের একটি পা ভেঙে গেল। এই ভাঙা পা আর কোনো দিনই সারেনি। রামমোহন অবশ্য ভ্রূক্ষেপই করেননি শরীরের এই কষ্টকে। কেপ টাউনে আরও একটা ঘটনা ঘটল। তিনি দেখতে পেলেন দুটি ফরাসি জাহাজে তেরঙা পতাকা উড়ছে। রামমোহন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বপ্নের জাহাজ। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর পতাকা! রামমোহন ভাঙা পা নিয়েই একখানি জাহাজে উঠে এলেন। শরীরের কষ্ট ভুলেই গিয়েছিলেন রামমোহন। বিপ্লবের পতাকাকে শ্রদ্ধা জানালেন। আনন্দে বলে উঠলেন — অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন ফ্রান্সকে। ফ্রান্সকে অভিনন্দন জানানো মানে বিপ্লবকে অভিনন্দন। কখনো কখনো বিপ্লবও যে প্রয়োজন, এই সত্যটি তিনি মেনেছিলেন।

রামমোহনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলি এখানে। সিল্ক বাকিংহাম রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৮২১ সালের আগস্ট মাসে তিনি একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। রামমোহন ছিলেন নিমন্ত্রিত। কিন্তু সে ভোজসভায় তিনি যেতে পারেননি।

একটি দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন রামমোহন সেদিন।

অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছে ইটালিকে। ইটালির স্বাধীনতা হরণ করেছে অস্ট্রিয়া। রামমোহন একেবারে ভেঙে পড়েন। সিল্‌ক বাকিংহামকে চিঠি লিখে জানান — স্বাধীনতার শত্রু এবং নির্দয়তার সাক্ষী রাজতন্ত্র কখনও সফল্‌ হতে পারবে না এ পৃথিবীতে। মানুষের মুক্তির জন্য রামমোহনের কী বিশাল আকাঙ্ক্ষা। আর তার শত্রুদের প্রতি কী প্রচণ্ড ঘৃণা রামমোহনের! যেখানেই তিনি স্বাধীনতার প্রকাশ দেখেছেন সেখানেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। স্পেনের দাসত্ব থেকে ১৮২৩ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি যেদিন মুক্তি পেল, সেদিন রামমোহন এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন। অভিনন্দিত হল উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। রামমোহনের ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। এ ব্যাপার যে তাদের দেশেও ঘটে না। তাঁরা রামমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির জন্য রামমোহনের এত আনন্দ কেন। রামমোহনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তো কিছু নেই। রামমোহন গর্জে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'What! Ought I to be insensible to my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interest, religion or language?' সংগ্রামীদের সঙ্গে রামমোহনের আত্মীয়তাবোধ এইভাবেই সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতভূমির সঙ্গে বিশ্বের যোগ ঘনিয়ে উঠল সেদিন। একেই বলা যায় বিশ্বপ্রেম। অনেককাল পরে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এইরকম ভাবেই বিশ্বের নির্যাতিত মানুষদের ঐক্যের কথা ভেবেছিলেন। রামমোহনের কথায় কাজে তারই সূচনা হয়েছিল।

৮ এপ্রিল ১৮৩১ সাল। রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছলেন।

রামমোহনকে অভ্যর্থনা জানাতে জাহাজঘাটাতেও সেদিন অনেক মানুষ এসেছিলেন। রামমোহনের খ্যাতি যে সমগ্র ইংল্যাণ্ডেই ছড়িয়ে পড়েছিল লিভারপুলের জনসমাগম থেকেই তা বোঝা যায়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম রস্কো লিভারপুলে থাকতেন। রামমোহনের পাণ্ডিত্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। রামমোহনের মেধা আর মনন তাঁকে স্পর্শ করেছিল। লিভারপুলের টমাস হাডসন যখন ভারতে

যাচ্ছিলেন, রামমোহনকে লেখা তাঁর একটি চিঠি পৌঁছে দিতে বলেন রস্কো। সে চিঠি অবশ্য রামমোহন পাননি। কেননা তখন রামমোহন জাহাজে। রস্কো সে চিঠিতে রামমোহনকে জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধা। নিন্দাও যেমন পেয়েছেন রামমোহন, তেমনি শ্রদ্ধাও কম পাননি তিনি।

রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছুলে রস্কো তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। রামমোহনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে রামমোহনকে শ্রদ্ধা জানাবার দিনটি পর্যন্ত তিনি বেঁচে আছেন। কী অসীম আকৃতি আর শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে এই অনুভবে, প্রীতিতে। রামমোহন প্রথমেই ভারতীয় প্রথায় রস্কো সম্মান জানিয়ে বলেছিলেন 'যাঁর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাঁকে দেখতে পেয়ে তিনি সুখী এবং গর্বিত'। রস্কো তখন রোগশয্যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের এই দৃশ্য কে ভুলতে পারে?

ম্যাঞ্চেস্টারের কল-কারখানা ঘুরে দেখলেন। কারখানার কুলি-মজুরেরাও রামমোহনকে দেখে খুশি। রামমোহনকে তারা শ্রদ্ধা জানালেন। হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছিলেন সেদিন ভারতবর্ষের এই দৃপ্ত মানুষটিকে দেখতে।

লিভারপুল থেকে রামমোহন লণ্ডনে চলে এলেন। পথে যেখানেই সুযোগ মিলল দর্শনার্থীরা রামমোহনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। লণ্ডনে রিজেন্ট স্ট্রিটে বাড়ি নিলেন তিনি। সারা শহরময় রামমোহনকে দেখবার জন্য উত্তেজনা। বেলা এগোরাটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেরই ভিড় রামমোহনের বাড়িতে।

এখানে একটি চমৎকার ঘটনার কথা বলা যাক। কিছুদিনের জন্য রামমোহন বণ্ড স্ট্রিটের একটা হোটেলে আছেন। মাঝরাতে হঠাৎ একদিন এসে হাজির বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। বেন্থামের তখন জগৎ-জোড়া নাম। এদেশেও তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কেউ কেউ। রামমোহনও তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থামের প্রভাবে উদ্দীপ্ত ছিলেন এও আমরা জানি। জগতের সুখের তাৎপর্য কী বেন্থাম তা বুঝিয়েছিলেন তাঁর লেখায়। রামমোহন

যখন লণ্ডনে পৌঁছান বেন্থাম তখন বৃদ্ধ। কারও সঙ্গে বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না। কিন্তু তিনিই ছুটে এসেছেন রামমোহনকে দেখতে!

ইউরোপের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা রামমোহনকে সম্মান জানাতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজার ভাই ডিউক অব কাম্বারল্যাণ্ড হাউস অব লর্ডসে রামমোহনকে বিধিমতে পরিচিত করে দেন। রামমোহন চেয়েছিলেন বলে টোরি সদস্যরা জুরি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেননি। ব্রাহাম, যিনি ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব হল। ব্রাহামের সঙ্গে মনের মিল হল এ কারণেও যে তিনি জনশিক্ষার প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার প্রচারে ব্রতী ব্রাহামকে রামমোহন তো কাছে টেনে নেবেনই। ১৮৩১ সালে ৬ জুলাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটররা রামমোহনকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করলেন। ভারতে এই কোম্পানিই রামমোহনের 'রাজা' উপাধিকে মেনে নেয়নি। কী বিচিত্র গতি সময়ের! তাঁরা স্বীকার করলেন ভারতীয়দের জন্য সেবাব্রতে রামমোহনের অবদান স্মরণযোগ্য। মৌমাছি যেমন বাগানের ফুলগুলি থেকে সবচাইতে মিষ্টি মধু আহরণ করে, তেমনি রামমোহন ভ্রমণ ও পঠনের দ্বারা অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে মধু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মানসিক প্রকর্ষের তুলনা নেই — এই সত্য উচ্চারিত হল কোম্পানির চেয়ারম্যানের কণ্ঠে।

আরও আছে। চতুর্থ উইলিয়মের অভিষেক-উৎসবে ইউরোপের রাজশক্তিগুলির রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে আসন লাভ করেন রামমোহন। রামমোহন সেখানে ভারততত্ত্ববিদ্ হেনরি টমাস কোলব্রুকের সম্মানার্থে ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জ্ঞানতাপসের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা প্রকাশের এই ছিল উপযুক্ত জায়গা। তিনি মানবতাবাদী সমাজহিতৈষী রবার্ট আওয়েনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রামমোহন কেবল ভারতের নন, তিনি সকলের। ইংল্যাণ্ড প্রজামঙ্গলের জন্য রিফর্ম বিলের সমর্থক। বিলটি কমন্স সভায় পাশ হলেও লর্ডসের সভায় নাকচ হয়ে যাচ্ছিল। তৃতীয় দফায় যখন বিলটি লর্ডসের সভায় প্রেরণ করা হল তখন ইংল্যাণ্ডের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এর পরিণাম সম্বন্ধে। রামমোহন তখন সেখানে। তিনিও

উত্তেজিত। বিলটি পাশ হয়ে গেল। রামমোহনের আনন্দ দেখে কে? উইলিয়ম রাথবোনকে তিনি চিঠি লিখে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ সরকার আর একটি ভুল শুধরে নিলেন। রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করে নিলেন তাঁরা। অদৃষ্টের কী পরিহাস! রাজাকে সম্মান না জানালে ইউরোপের রাজনৈতিক আর শিক্ষিত মহলে তাদের সম্মান যে লুটিয়ে পড়বে। রাজা উইলিয়ম রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতেও সম্মত হলেন। লণ্ডন একটি সেতুর উদ্বোধন হবে। রাজাকে চাই। নিমন্ত্রিত হলেন রামমোহন সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজসভায়।

রাজার সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন তো হচ্ছিলই একের পর এক। জেরেমি বেন্থাম এরকম একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনের ইউনেটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন রাজাকে সংবর্ধনা জানায় সাড়ম্বরে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. বাওরিং। তিনি রামমোহনকে প্লেটো, সক্রেটিস, মিলটন, নিউটনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'হাজার হাজার বছর আগেকার সেসব মনীষীকে পেলে আমরা যেমন আনন্দিত হতাম, তেমনি হাজার হাজার মাইল দূর দেশ থেকে আগত ওই মানুষটিকে পেয়ে আমার সেই অনুভূতি হচ্ছে।' ড. বাওরিং-এর এই অভিমত যেন ভারতবর্ষকে এক লাফে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমান সারিতে এনে দিল। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ড. কার্কল্যাণ্ড ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমেরিকায় স্বাগত জানান রামমোহনকে।

রামমোহন অভিভূত। তাঁর চিন্তাধারা যে বিদেশে সম্মানিত সেজন্য তিনি আনন্দিত। তাঁর কথায় বলি 'বিচারবুদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রের, সহজবুদ্ধির সঙ্গে সম্পদের, শক্তির সঙ্গে সংস্কারের সংগ্রাম চলছে। এই তিনটির সঙ্গে ঐ তিনটি যুদ্ধ করে আসছে। আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ হোক বা কাল হোক আপনাদের জয় অনিবার্য'। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী রামমোহনের চরিত্রের পরিচয় পাই এখানে।

ইংল্যাণ্ডে যে উদ্দেশ্যে রামমোহন এসেছিলেন সে কাজও যথাসাধ্য তিনি করে ফেললেন। দ্বিতীয় আকবরের বাৎসরিক অনুদান বাড়ানো হল তিন লক্ষ টাকার মতো।

কিন্তু বেথির সতীদাহ সওয়াল? যার আড়ালে ব্রাহ্মণ্য শক্তির আস্ফালন? যাদের উসকানিতে পাড়ায় পাড়ায় রামমোহনের বিরুদ্ধে ছড়া তৈরি হয়? *'ব্যাটার সুরাই মেলের কুল,/ ব্যাটার বাড়ি খানাকুল,/ ব্যাটার জাত বোস্টম কুল,/ ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা/ বানিয়েছে স্কুল —'*। রামমোহন একের পর এক যুক্তি দিতে লাগলেন। যুক্তি তো নয়, তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্র। বেথি দাঁড়াতে পারলেন না। রামমোহন তো প্রতিবাদীর (Oppressed) পক্ষে। উকিল (Advocate)-এর সম্বল কেবল পাঁজিপুথি। সেদিন কে শুনবে সেই সব কথা। মানুষ তো অন্যকালে পৌঁছে গেছে, উদয় দিগন্তের শঙ্খধ্বনি সে শুনেছে। রামমোহনের কণ্ঠে সেই বজ্রনির্ঘোষ। নাকচ হয়ে গেল রক্ষণশীলদের আপিল।

রামমোহন জানতেন ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের মেয়াদ বাড়ানো হবে। তখন আইনের রদবদল হবে, সংস্কারের কাজ হতে পারে, নাও হতে পারে। তিনি ইংরেজকে ভারতের সমগ্র চেহারাটা বোঝাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। হাউস অব কমন্সে সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহনকে আহ্বান করা হল তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য। এটাই তো রামমোহন চেয়েছিলেন। রামমোহন যা বলেছিলেন তাঁর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল দেশপ্রেম। প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি সিলেক্ট কমিটির জন্য জবাব তৈরি করেছিলেন। সেখানেও রামমোহনের মেধা আর মননের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে। রামমোহনকে

কোন কোন বিষয়ের জবাব দিতে হয়েছিল বলি।

প্রথমে, ভারতবর্ষের রাজস্ব-প্রথার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে রামমোহনের অভিমত কী তা জানতে চাওয়া হয়। রামমোহন প্রজাস্বত্ব, খাজনার হার, কৃষক এবং জনসাধারণের উন্নতি সম্পর্কে মতামত দেন। দ্বিতীয়ত, বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে রামমোহনের অভিজ্ঞতা। রামমোহন বিচারপদ্ধতির প্রায় চুলচেরা বিচার করে সমস্যার প্রকৃত রূপ দেখিয়ে দেন। সমাধান কী হতে পারে সেকথাও তিনি জানান। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে রামমোহনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল কোনো মত আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। রামমোহন তাঁর বিবেচনামতো উত্তর দেন। চতুর্থত, ভারতের প্রজাদের অবস্থা। বিষয়টি রামমোহনের কাছে ছিল জরুরি। রামমোহন সবিস্তারে তার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন।

রামমোহনকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং রামমোহন যে জবাব দিয়েছিলেন তা এত বিস্তারিত যে এখানে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়। খুঁটিয়ে দেখলে সেসব উত্তরের মধ্যে পাব রামমোহনের দেশের জন্য শ্রদ্ধাবোধ, দেশের মানুষের প্রতি আন্তরিক টান, নিপীড়িতের প্রতি দরদ। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি রামমোহনের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জবাবে। শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানের উন্নতিকে বাধা দিয়ে স্বৈরাচারী শাসন বর্বরতার দিকে ঠেলে দেয় দেশকে। রামমোহন দেখিয়েছেন জ্ঞানের চর্চা যে দেশে যত বেশি সে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা তত সুরক্ষিত।

আর কৃষকদের কথা? রামমোহনের পরে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে বঙ্গদেশের কৃষকের কথা বলেছেন। আমরা দেখি রামমোহনই প্রথম জমিদারি ব্যবস্থার ত্রুটি কোথায় দেখালেন। কৃষকের দুর্দশার কথা শোনালেন, সুবিধাভোগী শোষক জমিদারদের চেহারাটা তুলে ধরলেন তাঁর জবাবে। তিনি দেখালেন কৃষকের দুর্দশা বেড়ে গেছে জমিদারি প্রথার জন্যেই। জমিদারের স্বার্থপরতা আর লোভ কৃষকের সর্বনাশ করেছে। আর সরকারি আমিনের অসাধুতার চাপে কৃষক মৃত্যুর মুখোমুখি। জমিদাররা

যখন খুশি খাজনার হার বাড়িয়ে দেন। সরকার জমিদারকেই সমর্থন করে। ফলে কৃষকের সর্বনাশ। কোনো বছর বাড়তি ফসল হলে ফসলের দাম কমে যায়। ফলে কৃষককে সব ফসল বেচে দিয়ে জমিদারের খাজনা মেটাতে হয়। কৃষকরা উপোসী থাকে, নূতন করে ফসল বোনবার জন্য বীজধানও থাকে না ঘরে।

রামমোহন নিজে জমিদার। কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থার কুফল কোথায় তখনই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি অবশ্য জমিদারি ব্যবস্থা উঠে যাক এমন কথা বলেননি। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথও তাঁর বৌমাকে জমিদারি ব্যবস্থার বোঝা যে কী কঠিন হয়ে বাংলাদেশের বুকে চেপে বসে আছে সেকথা জানিয়েছিলেন। জমিদাররা যে বৃহৎ মাছ! ছোটো মাছ দেখলেই খেয়ে ফেলে। একথা জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সংস্কারের পথটা প্রশস্ত হয়েছে।

আর ভারতে ইংরেজের আইন? সে কেমন? বহুকাল পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরেজের আইনকে অল্পবিস্তর সাধুবাদ জানিয়েছে। রামমোহনকে সিলেক্ট কমিটি যখন প্রশ্ন করেছিল এ আইনের শাসন কী রকম? ইংরেজের বিচারব্যবস্থা কেমন? ত্রুটি থাকলে শোধরাবার পথ বলে দিন। রামমোহন বলেছিলেন, ইংরেজ বিচারপতিরা ভারতীয় নন। ভারতের চালচলন সমাজব্যবস্থা কাজকর্ম সম্পর্কে এঁদের কোনো জ্ঞান নেই। তাঁরা কী বিচার করবেন? অন্যদিকে ভারতবাসী বহুকাল ধরে পরাধীন, পেয়েছে উপেক্ষা। তাঁদের উপর দেশবাসীর কোনো বিশ্বাসই নেই। সুতরাং তিনি চেয়েছিলেন এমন বিচারপতি যাঁর মধ্যে থাকবে ভারতীয় অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপীয় ন্যায়পরায়ণতা। এই দুয়ের যোগাযোগেই ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সুষ্ঠু কাঠামো গড়ে উঠবে।

আমাদের কি মনে হতে পারে রামমোহন ইংরেজদের স্তাবকতা করছেন? এমন ধারণাই কেউ কেউ করেছেন। আসলে ইউরোপের কাছ থেকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন, বিপ্লবের আদর্শ শিক্ষিত ভারতবাসী চেয়েছিল, তাই চেয়েছিলেন রামমোহন। কিন্তু ইংরেজ ভারতবাসীর সে প্রত্যাশা পূরণ করেনি। ফলে সভ্যতারই সংকট দেখা দিয়েছিল একদিন।

১৩

ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের মানবধর্মের জয় ঘোষণা সে দেশের মানুষকে স্পর্শ করেছিল। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কেউ যেন বক্তৃতায় বলছেন নূতন ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র। সেখানে রামমোহন হবেন নূতন গভর্নর জেনারেল। বিচারপতি হবেন কোনো মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্য থেকে মনোনীত হোন রাজস্ববিভাগের সচিব। পুলিশ বিভাগের ভার নিক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কেউ। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের মানুষই ভারতশাসন ব্যবস্থায় উঠে আসুক। আর রামমোহন? তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না ক্রিশ্চান। তিনি নিরপেক্ষ। তিনি শাসনভার নিলে ভারতের উন্নতি দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সত্তর আশি বছর পরে স্বপ্নে যে উজ্জ্বল ভারতবর্ষের ছবি পেয়েছিলেন তাকেও কেউ মেনে নেবে না সত্য। কিন্তু এরকম মজার 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর চিত্র আঁকতে রাজনীতির চিন্তানায়কেরা উদ্যোগী হন, দেখতে পাচ্ছি।

রামমোহনের স্বপ্ন আরও ব্যাপক। মধুসূদন স্বপ্ন দেখতেন ইংল্যাণ্ডে যাবেন। রামমোহনের স্বপ্নের দেশ ফ্রান্স। যে ফ্রান্সের জনগণ বাস্তিল কারাগার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যে ফ্রান্স থেকে তিনি পেয়েছেন তার চিন্তার রসদ। তিনি ফরাসি দরবারের কাছে যাবার অনুমতি চাইলেন। ফরাসি সরকার বেঁকে বসল। তাঁদের ইচ্ছা নয় রামমোহন তাদের দেশে আসুক।

রামমোহন গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। জেগে উঠল নিষেধের প্রাচীর যারা তোলে তাদের বোঝানো, মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ নেই। রুশো, ভলতেয়ারের দেশেও নিষেধের প্রাচীর? আলোকপ্রাপ্ত মানুষ তো

এই দেশেই রয়েছেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা তো ফ্রান্সই ঘোষণা করেছে! আশ্চর্য, সেই দেশে এই সংকীর্ণতা! রামমোহন বড়ো মাপের একটি দরখাস্ত পেশ করলেন। তিনি মানুষের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য যে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা আছে তা তুলে দিতে বললেন। রামমোহন ফরাসি বিদেশ মন্ত্রীকে জানালেন, গত বারো বছর ধরে তিনি ফ্রান্সে যাবার পরিকল্পনা করছেন। যে ফ্রান্স সংস্কৃতিতে উন্নত, স্বাধীন ইচ্ছায় লালিত তাকে দেখবার সাধ তাঁর প্রবল। বহু কষ্ট করে তিনি লণ্ডনে পৌঁছেছেন। ধর্মীয় বাধা, পথের বাধা অতিক্রম করে তিনি পা ফেলতে পারছেন না তাঁর প্রিয় ফ্রান্সে। এ কেমন করে হতে পারে? এশিয়ায় এ বিধি নিষেধ নেই। চীন দেশে এ প্রথা চালু থাকার কারণ তারা অপর দেশ সম্বন্ধে ঈর্ষালু। এখন সকলেরই জানা উচিত কেবল ধর্মই নয়, নিরপেক্ষ কাণ্ডজ্ঞান, বিজ্ঞানসাধনা সেই পথে মানবজাতিকে নিয়ে যাচ্ছে যে পথ বলে সব মানুষই এক পরিবারের। এই পরিবারেরই বিভিন্ন শাখা দেশে দেশে জাতি হিসেবে বাস করে, এমনকী আদিবাসীরাও ওই পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একদেশের মানুষের অন্য দেশের মানুষকে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া উচিত। তার ফলে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে অনেক সংশয় কেটে যাবে। উভয় দেশই তাতে উপকৃত হবে। অবশ্য যুদ্ধের সময় এ ব্যবস্থা কিছুটা বদলানো যেতে পারে। আর যুদ্ধ? সে তো এক দেশের স্বার্থ কী, তা বোঝার ভুলের জন্য।

এখন যখন বহুদিন যাবৎ ইউরোপে শান্তি বিরাজ করছে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যখন ফ্রান্সের কোনো বিরোধ নেই তখন ফ্রান্সের এই আচরণ হবে অভদ্রোচিত এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব।

যদি রাজনৈতিক কারণে এই নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন হয় তাহলেও আমি বলব এর কোনো প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে বিরোধী দু'দেশের মানুষ এক বৈঠকে মিলিত হোন, ভোটের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তখন। এই বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত হবেন পর্যায়ক্রমে। একবার এদেশ একবার ওদেশ। এমনকী এক এক বছরে বৈঠকের স্থানও সে ভাবে ঠিক করা যেতে পারে। ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ডোভার আর ক্যালে এইরকম স্থান হতে পারে।

দুই দেশের এই বৈঠকে সকল রকমের বিরোধ — রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক — মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী শান্তিও বজায় থাকবে বহুদিন। বন্ধুত্বই আসল কথা। বৈঠকের মধ্য দিয়েই সেই বন্ধুত্বের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

রামমোহনের এই বক্তব্য বিশ্বশান্তির দলিল, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অভিজ্ঞান। মানুষের ধর্মের সারাৎসার। বিশ্বজনীনতার অনুরণন এই পত্রে। হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে সকল মানুষই যে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এ উদার বাণী রামমোহনের কাছ থেকে আমরা পেলাম। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্বকে মেলাতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে। আর কী বলার প্রয়োজন আছে? ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ রামমোহনের আকাঙ্ক্ষার যোগ্য সম্মান দিলেন। আমন্ত্রিত হলেন ফ্রান্সে। রামমোহন ফ্রান্সে এলেন।

১৪

ফ্রান্সের জনতা রামমোহনকে সংবর্ধনা জানাল। অবশ্য ১৮২৮ সালেই 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' রামমোহনকে অ্যাসোসিয়েট করেসপণ্ডেন্ট খেতাব দান করেন। সিসমঁদি নামে এক পণ্ডিত রামমোহনের যে পরিচয় ঐ উপলক্ষ্যে দিয়েছিলেন সেখানে তিনি লিখেছিলেন রামমোহন সংস্কারমুক্ত মানুষ, তিনি সত্যস্বরূপ এক ঈশ্বরের উপাসনা, নীতি ও ধর্মগত একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। সুতরাং ফরাসি দেশের মানুষের রামমোহনের খ্যাতি এবং পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। উজ্যান বুর্নুফ রামমোহনের রচনার যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন এক সময়ে। বেদান্তের অনুবাদে রামমোহনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

রাজা ফিলিপ রামমোহনকে এক ভোজে আমন্ত্রণ জানান। প্রচুর সম্মান 'রাজা' পেলেন এখানে। তাঁর মন প্রসন্নতায় ভরে গেল।

তিনি লণ্ডনে চলে এলেন। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে রাজার অর্থের টানাটানি আরম্ভ হল। রামমোহনের ভারতবর্ষের টাকা পয়সা যে দুটি

ব্যাঙ্ক থেকে বিলেতে আসত, সে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে রামমোহন টাকা ধার চেয়েছিলেন, তাও পেলেন না। ইংল্যাণ্ডের হেয়ার পরিবার অর্থ দিতে চাইলে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধল। তিনি অর্থ নিলেন না। রামমোহনের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। ভাঙা পা-এর রোগযন্ত্রণাও তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। রামমোহনের বন্ধুরা তাঁকে হাওয়াবদলের জন্য লণ্ডন থেকে ব্রিস্টলে চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেণ্ড ডক্টর কার্পেন্টারের আমন্ত্রণে তিনি ব্রিস্টলে এলেন।

এখানে এসে রামমোহনের অর্থকষ্ট দূর হল। মিস কিডিল নামে এক মহিলা স্টেপ্ল্টন গ্রোভে তাঁর বড়ো বাড়ির অনেকটাই রামমোহনের জন্য ছেড়ে দিলেন। মিস কিডিলকে রামমোহন শ্রদ্ধা করতেন। পুত্রকে তাঁর কাছে রেখেই শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন। মিস ক্যাসেল নামেও এক মহিলা রামমোহনের অন্তরঙ্গ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে রামমোহন রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করেছেন। ড. কার্পেন্টার, মিস কিডিলের বদান্যতায় রামমোহন বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। শান্তিও ফিরে পাচ্ছিলেন। কিন্তু একটানা পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে গেল।

ড. ল্যান্ট কার্পেন্টার, যাজক লিউইনে প্রমুখ বন্ধুদের সাহচর্যে রামমোহন তবুও কিছুটা সুস্থ বোধ করতেন। ১৮৩৩ সালে ১৯ সেপ্টেম্বরে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বর আর মাথার যন্ত্রণা এ দুয়ের আক্রমণে রামমোহন দুর্বল হয়ে পড়লেন। ডেভিড হেয়ারের বোন তাঁর সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু রামমোহন আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। ডাক্তাররা আর কোনো ভরসা দিতে পারলেন না।

ড. ইস্টলিন চিকিৎসা করছিলেন রামমোহনের। শেষের কয়েক ঘন্টা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন 'শুক্লপক্ষের রাত ছিল সেটা। মিঃ হেয়ার, মিস কিডিল, আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলাম — সেখানে গ্রামের শান্ত মধ্যরাত্রির দৃশ্যপট বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে ঘরের মধ্যে সেই অনন্যসাধারণ মানুষটি মৃত্যুর পথে চলেছিলেন। সেই মুহূর্তটি আমি কখনও ভুলব না।'

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ সালের সেই রাত্রি আড়াইটার সময় মিঃ

হেয়ার ঘরে এসে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেছে। দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।'

১৮৩৩ সালে ১৮ অক্টোবর স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভে সমাহিত করা হল রামমোহনের দেহ। রাজার সঙ্গে যাঁদের বন্ধুত্ব ছিল ওই শোক-অনুষ্ঠানে সকলেই এসেছিলেন। হেয়ার সপরিবারে লণ্ডন থেকে এলেন। মিস ক্যাসেলের অভিভাবক ও আত্মীয়েরা, শেষ সেবায় যিনি ছিলেন সেই মিস হেয়ার, রাজার পালিত পুত্র রাজারাম, ব্রাহ্মণ চাকরেরা, ডাক্তাররা, ড. জেরার্ড, জন ফস্টার, কার্পেন্টারের পিতা ও কার্পেন্টার।

সকলেই শোকস্তব্ধ। জন ফস্টার বলেছেন 'এমন একটি সমাধির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা কার ছিল!' দশ বছর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর লণ্ডনে গেলে তিনি স্টেপ্‌ল্‌টন থেকে রামমোহনের দেহ 'আরনোস ভেল' নামে আর এক জায়গায় সরিয়ে এনে সমাধিস্থ করেন। তিনি তার ওপরে তৈরি করে দেন অপূর্ব একটি মন্দির।

সে মন্দিরে ভারতপথিকের যাত্রার শেষ, আবার সেখান থেকেই নবীনকালের যাত্রার শুরু।

১৫

রামমোহনের প্রবাসযাত্রা সফল।

ফিরে এলেন না ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতে তৈরি হয়েছিল তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী। এখানে থাকতেই রামমোহন তাঁদের বন্ধুত্বের ভালোবাসা পেয়েছিলেন তাঁর প্রতিটি কাজে। হিন্দু কলেজের এক দল তরুণ বাঙালি রামমোহনের পথেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন দেশসেবায়, সংস্কারকর্মে। তাঁদের দলপতি ডিরোজিও 'অ্যাকাডিমিক অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তুলেছিলেন। এক অর্থে তাঁরা ছিলেন বিদ্রোহী। কিছুটা অস্থিরতা তাঁদের কাজেকর্মে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের স্বদেশপ্রেম অকৃত্রিম — ভালোবাসায় উজ্জ্বল। ডিরোজিওর কণ্ঠে পাই 'স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী/ভূষিত ললাট তব'। রামমোহনের ভারতপ্রেমও এই বোধে দীপ্ত। ১৮৩৮ সালে রামমোহনের আদর্শই প্রতিপালিত হল 'সাধারণ

জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য়। আরও কিছু সভা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষিত বাঙালি, রামমোহনেরই সাধনাকে সফল করে তুলতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রামমোহনের সময়ে ভারতবর্ষে কালরাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছিল। শাস্ত্র না বুঝে 'ওঁ তট তট তোতয় তোতয়' মন্ত্র পাঠ করছে। ভয়ে, আতঙ্কে মানুষ বাস করছে একটা ঘেরাটোপে। দরজা জানালা সে খোলে না, তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে খুললেই একজটা দেবী দেখা দেবে। তাহলে সর্বনাশ। একটা অচলায়তনের প্রাচীর গেঁথে দিয়েছে তার সামনে। মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ বজায় রাখবার জন্য বাঁধ দিচ্ছে একের পর এক।

রামমোহন অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছেন। মানুষের মূঢ়তার শেকল ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। মানুষের অধিকার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ভারতবর্ষকে বিশ্বের মিলনের সেতু হিসেবে রচনা করেছিলেন তিনি। সেই আমাদের উত্তরাধিকার।

কতটা তা পালন করছি আমরা? এই প্রশ্ন কতটা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে? জ্ঞানবিজ্ঞানকে মানুষের কাজে আমরা কতটা ব্যবহার করতে পেরেছি? 'আমাদের অজ্ঞান' — আমাদের 'দুর্বলতাই' বিরোধীদের 'বল'। রামমোহন অক্লান্তভাবে বিরোধীদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করেছেন, রামমোহনের সেই সংগ্রামকে আমরা দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় আরও শক্তিশালী করে তুলব — এই প্রতিজ্ঞা কি আমরা নিতে পারি না?

□□

Printed at Shivam Offset Press, A-12/1 Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110 028